আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
এবং হিউম্যানিস্টস্
অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র
রবীন্দ্র সংখ্যা মে ২০০৯

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন

সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল

দাম : পঁচিশ টাকা

উপদেষ্টা : প্রবীর ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : ২৫৫৯-০৪৩৫

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
পি ২, ব্লক বি, লেকটাউন কলকাতা-৮৯
ফোন : ২৫২১-৬২৭০

সূচি

সম্পাদকীয়/২

চয়ন :
নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ/৩
কবিতাগুচ্ছ : /৫-২২

রিপোর্ট :
যুক্তিবাদী সমিতির পঁচিশে পা/২৩

প্রবন্ধ :
সমস্যা : আত্মহত্যা : ডা: প্রতনু সাহা/২৭

বিশেষ প্রবন্ধ :
হিজড়েদের টাকা তোলা বে-আইনী : মানসী/৩২
তসলিমা প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষের বিশেষ সাক্ষাৎকার/৩৮

প্রবন্ধ :
রোকেয়া সাখাওয়াত : চৈতালী/৪২

সংগঠন সংবাদ : /৪৫

আইন :
জ্যোতিষী তান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে/৪৬

পুস্তক সমালোচনা : /৪৮-৫৩

সত্যানুসন্ধান : /৫৪

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ২০০৭ সাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সত্যি সত্যিই নবজাগরণের বছর হিসেবে ইতিহাসে জায়গা পাবে এই বছর। নন্দীগ্রাম থেকে রিজওয়ানুর প্রমুখ বিষয়কে কেন্দ্র করে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত থেকে বুদ্ধিজীবীদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আগে কখনো দেখা যায়নি। ২০০৮ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটে আমজনতা ব্যালট বাক্সে তাঁদের সব ক্ষোভ উগরে দিলেন। তৃণমূল স্তরে শাসকদল ভীষণভাবে পরাজিত হল। তারা বুঝল ৫৬ হাজার কারখানা বন্ধ করে এবং একই সঙ্গে শিল্পপতিদের দালালি করে, উন্নয়নের নাম করে আখের গোছানোর দিন শেষ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পানীয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সবেই ৩২ বছর ধরে পিছিয়ে রেখে উন্নয়নের কথা বলা স্রেফ ভণ্ডামি। ২০০৯ সালের লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্ট যদি অর্ধেকের বেশি আসনেও জেতে তবুও প্রমাণিত হবে না যে, বামফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন বেশি। কারণ পশ্চিম বাংলায় সাধারণ মানুষের একটা অংশমাত্র স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এই ভারতেই স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোতে, অর্থাৎ 'মাওইস্ট মুক্তাঞ্চল' এর গ্রামগুলোতে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ভোটে অংশ নেয় নিজের ইচ্ছেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এখানে গণতন্ত্র সার্থক। আমরা চাই পৃথিবী জুড়ে এমন গণতন্ত্রেরই প্রসার ঘটুক।

রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন—যখন একথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা আমিই এ কাজে লাগব।

সেই কাজে লাগতে গিয়ে দেখলেন সংস্কারের এবং স্বার্থের বেড়াজালে ঘেরা চাষী মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলাচ্ছে। তিনি শুরু করেছিলেন সমবায় আন্দোলন। কিন্তু সাধারণের বুদ্ধির ভীরুতায় এবং উদ্যমের অভাবে সেই সমবায় আন্দোলন সফল হয়নি।

আজ সময় এসেছে। সমবায় আন্দোলন গতি পাচ্ছে; শুরু হয়েছে সত্যিকারের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

চ য় ন

নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

সৌমেন্দ্রনাথ বসু

সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধ সংকলনটিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বিষয় যেমন জাতীয় সংহতি, ভাষাশিক্ষা, বিজ্ঞানচেতনা, নাস্তিকতা এমনকি পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রচর্চা ভবন প্রকাশিত এই বইটি থেকেই এবারের চয়ন।

... ১৩৭৬ সালের (১৯৩৯) আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথ 'রবিবার' গল্প লেখেন। বয়স তখন আশির কাছাকাছি এসে ঠেকেছে। পুরনো ভাবনাগুলি ছেড়ে যেতেই ছিঁড়ে যেতেই যেন কবির আনন্দ। বয়স যত বেড়েছে ততই যেন চিন্তার পুরনো আবেগের বাঁধন খসেছে। সংসারে এর উল্টোটাই ঘটে। রক্তে জোয়ার-লাগানো যৌবনে ভগবৎসত্তায় প্রবল অবিশ্বাস জানিয়ে কর্মাবসানে 'মা ফলেষু' আওড়াতে দেখা যায় কর্ম-অবসৃত উদ্যানবিহারী বৃদ্ধদের। কিন্তু সে পরিণতির জীর্ণতা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আসেনি। যত দিন গেছে মন তাঁর উদার হয়েছে, চিন্তার দীপ্তি প্রখরতর হয়েছে। তাই জীবনপ্রান্তে এসে রোম্যান্টিক প্রেমের কাহিনীর নায়ককে নাস্তিক কল্পনা করতে তাঁর একটুও বাধল না।

প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে নিরেট আচারঘেরা সনাতনী ঘরের প্রাকার ফুঁড়ে কাঁটাওয়ালা নাস্তিক গজিয়ে উঠল—বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশের দুর্দান্ত কালাপাহাড়—অভয়াচরণ। কুলধর্মের ছাপটা নাম থেকে মুছে দিতে সে নিজের নামকরণ করলে অভীককুমার। অভীকের পিতামহদের একজন ছিলেন নাস্তিক, তর্কশাস্ত্রের নজির তুলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের দুর্গকে আক্রমণ করতেন।

... পিতামহ আচারধর্মে হাত দেননি কিন্তু অভীকের আঘাতটা গিয়ে পড়ল সেই আচারের গায়েই। অবশেষে সহনশীল পিতা একদিন পুত্রকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

অভীক আর্টিস্ট এবং যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষও বটে। রবীন্দ্রনাথ তাকে চওড়া বহরের মনুষ্যত্বের মাপেই এঁকেছেন।

... এ হেন আর্টিস্ট অভীক ভালোবাসে বিভাকে।

... অভীক ভেবে পায় না যে বুদ্ধিমতী বিভা কী করে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। বলেছে বিভাকে, "বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু আছে,

তবু ভগবানকে বিশ্বাস কর কী করে?" বিভাকে বিয়ে করতে চায় অভীক, কারণ তাদের মধ্যে জাতিগত ধর্মগত পার্থক্য থাকলেও তার কোনো কিছুরই মানবার বালাই নেই। যে কোনো বিশেষ আচরণগত ধর্ম মানে, তারই আচার ভাঙতে হলে শুদ্ধতার চেতনায় যা লাগে। কিন্তু অভীক বলছে, "তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে।"

অভীককে নাস্তিক করে গড়ার একটি কারণ এই যে তাদের মিলনের বাধা হিসাবে ওই ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যকে বড়ো করে দেখানো হল। অভীকের অভিযোগ স্পষ্ট, "তুমি যাকে ঐশ্বর্য বল তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।" তার মনের কামনাও স্পষ্ট, "আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পারোনি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে।" ...

... ভারতবর্ষে যে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে এত খুনোখুনি তার মূলেই হচ্ছে নিজের দেবতার শ্রেষ্ঠত্বে অন্ধ বিশ্বাস অর্থাৎ ভগবৎচেতনায় আসলে অবিশ্বাস। তাই অভীক বলছে দম্ভভরে, "যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই।" এই অভীকই দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা বিভার শিক্ষক অমরবাবুর বিলেত যাবার জন্যে এনে দিয়ে বলেছে, "আমি নাস্তিক, আমি বুঝি সত্যকার পূজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে।" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চাঁদা তোলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দেখিয়েছেন ধর্মের নামে এক অনাচার চলছে গোপনে। আজকের দেশে সে অনাচার আর গোপন নেই—প্রকাশ্যেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা চাঁদা আদায়টাকে আক্ষরিক অর্থে সত্য করে তুলছে। ...

... কিন্তু এ হেন নাস্তিকেরও তো একটা বিশ্বাসের ক্ষেত্র আছে। সেটা রোম্যান্টিক প্রেমের জগৎ। যে প্রেম মানুষকে সীমা উত্তীর্ণ হতে শেখায়, সে প্রেম আসক্তির ঊর্ধ্বে জীবনের এক পরম গভীর পটভূমিকা রচনা করে, নাস্তিক অভীকের মন তার ভগবান খুঁজে পায় সেখানেই। 'নাস্তিক ভক্ত' নাম দিয়ে যে চিঠি অভীক পাঠিয়েছে তাতে লিখেছে "ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্য ভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তাহলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে।" নিশ্চিত জানি সংঘগত ধর্মবাদীরা এই ঈশ্বরকে তাঁদের ভগবান বলে মানতে রাজি হবেন না।

এ কথা বলা যায় না যে নাস্তিক হলেই মানুষ বড়ো আর ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেই হীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে এ কথাটা ছিল যে ঈশ্বরের কাছে নিজের ভালো-মন্দ দোষ-ত্রুটি সব কিছু সমর্পণ করার সুখ আস্তিকের আছে। সে জাতীয় আশ্রয় নেই বলেই নাস্তিকের নিজের কাছে সত্য হবার দায়িত্ব অনেক বেশি।

কবিতা

প্রাক্‌কথন

কবিতা হচ্ছে শীর্ষ শিল্প। সকল শিল্পের সেরা। সেই কবিতার এক গুচ্ছ নিবেদন রইল পাঠক পাঠিকার জন্য। আজ রবীন্দ্র জন্মোৎসবের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এগুলি আমাদের কবিতার শ্রদ্ধাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিভাবক, আমাদের শিক্ষক, আমাদের প্রেরণা। কোনো কবিতায় থাকল রবীন্দ্র অনুষঙ্গ কোথায়ও বা থাকল না। কিন্তু সমস্ত কবিতাগুলি দিয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের নিবেদন, এই নিবেদন অফুরান, কাল থেকে কালান্তরে চলতেই থাকবে। প্রবীর ঘোষ এবং সুমিত্রা আমাদের বন্ধু এবং সহৃদয় সহযোগী। তাঁদের পত্রিকার কবিতার পাতাটি সাজাতে পেরে ভালো লেগেছে খুবই। কবিরাও সহযোগিতা করেছেন অনেকখানিই।

আমাদের বিমুগ্ধতা আবার আমরা প্রকাশ করছি। প্রিয়তম কবির জন্মদিনে এই আমাদের প্রিয়তর উপহার ও শ্রদ্ধার্ঘ্য।

কৃষ্ণা বসু
(কবিতা সম্পাদক)

"তাদের বুদ্ধির পঙ্গুতার উপর নির্ভর করে একদিন আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের পায়ের তলায় চেপে রেখেছিলেন। হুকুম ছিল—মেনে চলবে, ভেবে চলবে না।... পৃথিবীতে বোধহয় সেই প্রথম ফ্যাসিস্ট প্রবর্তনা।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লজ্জা

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়

বলেছিলে, ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি
নিয়ে যাবি কে আমারে?’
তোমার সেই কথাকে সত্যি করে দিয়ে
তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল
দুবৃর্ত্তরা,
মোবাইলের টাওয়ার পৌঁছয় না
তোমার কাছে,
গানে কবিতায় একটি প্রণাম
আমাদের বোধ বিশ্বাস মননের ঘরে,
একটি সকাল স্মরণবেলা
আজ পঁচিশে বৈশাখ,
জন্মদিনের হাওয়ায় ভাসে
নতুন দিনের ডাক,
এবার কিছু বৃষ্টি আসুক
পুণ্যস্নাত পৃথিবীর ঘরে
তোমার মাথায় সূর্যোদয়ের মুকুট
তাকিয়ে আছো
কিছু অকর্মণ্য স্থবিরতার দিকে,

পারোতো একটা লজ্জাবস্ত্র
পার্শেল করে দিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

অরূপ পান্ডী

নদীতে জোয়ার এলে তুমুল জল
জল জলকে ভাসায়
কবির কাছে কবি এলে
কবিতা ভেসে যায়
স্বচ্ছ জলে কত অন্তঃসলিলা
নুড়ি শিল্প নদীতলে
শ্যাওলা গুল্মলতা প্রবালমহিমা

সন্ধ্যায় হাঁটি রবীন্দ্র জ্যোৎস্নায়
উপাসনা মন্দিরে অদৃশ্য কেউ ঘণ্টা বাজায়
মৃত্যুর পর এই দীর্ঘ বেঁচে থাকা পর্যাপ্ত পাহারায়
মুগ্ধতা আনে গানে গানে
পাখির পালকের মতো ছড়িয়ে পড়ে ভূমন্ডলে
কুড়িয়ে নিই গুঁজে দিই প্রেমিকার খোঁপায়
আনন্দ উৎসবে, দুঃখ কাতরতায় একাকীত্বে
কেবল তোমাকেই মনে পড়ে
আর কাউকে নয়॥

এদেশ আমার নয়

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এদেশ আমার নয়। এদেশ তো একশো কোটি
মানুষেরও নয়।
তবে কার? প্রশ্ন করি কাকে?

অসংখ্য পিঁপড়েরা মুখে উচ্ছিষ্ট গুড়ের টুকুরো নিয়ে
চলেছে গর্তের দিকে সারাটা বছর মাস। ভাবি—
ওই সব খুদে আত্মা দুর্ভিক্ষে দাঙ্গায়, আর

হাজার মৃত্যুর দুর্বিপাকে
মরে যেতে যেতে, তবু জীবনের ডাকে দেয় সাড়া!

বস্তুত দুর্বহ, তবু বয়ে নিয়ে যেতে যেতে তারা
ভাবে না কি—পৃথিবীর রূপরসরঙের
নিষিদ্ধ হাটে ওরা চিরকাল
অচ্ছুত রয়েছে, থাকবে চিরদিন'
ওই সব আনন্দের হাটে
তারা অবাঞ্ছিত, আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'

পাঁচশো কোটির কিংবা কয়েক কোটির অর্থ পিশাচের
কথা আজ বাসী হয়ে গেছে।
মানুষের ভাগ্য গড়ে দেবার মহান
শিল্পী ওরা।
গোটা দেশ জুড়ে চলেছে যে তাপপ্রবাহ
তাতেও সচ্ছন্দ। হাত জোড় করে বলে—তোমাদের
জীবন, সহজ ছন্দে ফিরিয়ে দেবার দায়
নিতে চাই আমি,
অথবা আমরা। থাকো পাশে।

ওদিকে সারাটা দেশ কাঁপে ভয়ে, দারিদ্রে সন্ত্রাসে।
পিঁপড়েরা উচ্ছিষ্ট গুড় নিয়ে খোঁজে গর্তের কিনারা।

এদেশ আমার নয়। প্রতিপদে মৃত্যু করে তাড়া।

ধুলোর ঝড়

রাণা চট্টোপাধ্যায়

ধুলোর ঝড় দেখছি
সব উড়িয়ে নিতে চাইছে
গ্রাম-শহর তছনছ করবে
অকাল বৈশাখীর ঝড়

মানুষ বুঝতে পারছে না
হঠাৎ এই সর্বনাশী ঝড় এলো কেন?

পশু পাখিরাও ভয়ে চোখ বন্ধ করেছে
ডাল ভেঙে ডিম সুদ্ধু নীড় ভূতলে।
বুঝতে পারছি মাঝ সমুদ্রে নিম্ন চাপ হয়েছে
অনেক দিনের গুমসানো গরম ছিল
অনেক দিনের অহংকার তিষ্ঠোতে দেয়নি,
আজ খানিকটা উপশম চাইছে মাটি।

তবু এই ঝড় ঘুরে যেতে পারে
শকুনির পাশার দানেও কি দুর্যোধনের
সিংহাসন রক্ষা হয়েছে?
বৃষ্টি আসবে, বৃষ্টিতে ধুলোর ঝড়
ধুয়ে যাবে দেখো, পরিতাপের অশ্রুজলে,
তখন আবার লাঙল কাঁধে নির্ভয়ে
ফিরে আসবে কাস্তের মানুষ।
নারকেল গাছের ফাঁকে উঠবে দ্বাদশীর চাঁদ।
ধুলোর ঝড় কেউ মনেও রাখবে না।
অকাল বৈশাখীর ঝড় থেমে গেলে
তুমি আমি সৌভাগ্য সাজিয়ে বসব
রাস্তার ওপর॥

ভয়

অনন্ত দাশ

এখন কারও খবর নিতে বড় ভয় করে
অনিশ্চয়তায় টলমল করছে প্রতিটা দিন
প্রতিটা রাত ডুবে থাকে ঘন অন্ধকারে
শুধু জেগে থাকার দুঃসাহস নিয়ে
আমি একা গোধূলি বেলায়...

জানলা দিয়ে শেষ চৈত্রের হু হু হাওয়া বইছে
ঘুম আর জাগরণের মধ্যে
পার হচ্ছি স্বপ্নময় নদী
অস্তিত্বের ছায়াছায়া অনুভবে
রৌদ্রময় কথোপকথন

এখন টেলিফোনে বা সাক্ষাতে
অন্য কারও খবর নিতে বড় ভয় করে
জীবন ও মৃত্যুর শান্ত অবসরে
পৃথিবীজোড়া যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের মধ্যে
হে আদিম অঙ্গার
তুমি আর ভয় দেখিও না!

পাতা

নাসের হোসেন

পাতার উপরে ঘুরিফিরি, ডালে ডালে, পাতার
আড়াল থেকে দেখি দূরের ও কাছের মানুষজনকে
পোকা বটে তবে পতঙ্গ, দুই ফিনফিনে ডানায়
পৃথিবী পর্যটন করি, পৃথিবী থেকে অনেকটা উঁচুতে
উঠলে বুঝতে পারি আমাকে কিছু একটা ভর করেছে
ভূতের রাজার জবর জবর তিন বরে কেঁপে ওঠে
নক্ষত্রজগৎ, ডানা থেকে দারুণ শব্দ, মাঝে মাঝেই
বলছি, হে জীবন এবার একটু নিঃশব্দে এগোতে
চাই, মহাজাগতিক আবির এসে লাগছে মুখে

খেলা

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা'
খেলছি যত ভুলে আছি আত্মবিলাপ
অংশত প্রাণ হাওয়া চঞ্চল উড়িয়ে দিয়েছি
পাতায় পাতায় নৃত্যপর মুক্তি আলোয়

দৃশ্যক্ষণ চরাচর আকাশ পাহাড় নদী
জলের সরলে, ভেসে যাচ্ছি স্রোতবিহ্বল
কলহপ্রবল ঘূর্ণি জটিল প্রবাহে—
প্রাণ থেকে প্রাণে গানের ভিতর দিয়ে
সমূহ সন্ধানে ভূমন্ডল পাতাল ভুবন
গ্রহ গ্রহান্তরে খুঁজি আত্মার ঘ্রাণ
আর ঝড়ের গোপন ফুল আশঙ্কা আকুল
ঝরে যায় অকাতর খেলার বিরহে

জিরাফ

তাপস রায়

আমি নই, তাহলে ওই মহামহিম হাওয়া
ওকে কে চুম্বন করবে, কে অভীপ্সা যোগাবে
মন্ত্র-নিশীথ জুড়ে কে অবাক আরোহী হয়ে ছুটে যেতে
চাইবে এক-একটি গ্যালাক্সি থেকে অন্যে...

আলিঙ্গন ঝরে পড়ছে সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতর, ঘন রস
বিজোড়িত হবার পর তারায় তারায় যেসব আভাস সঞ্চরমান
সেইসব অনাহুত নিঃশ্বাস জুঁই ফুলের মতো ছড়িয়ে রেখেছে
আর স্পর্শ রাত্রির বল্লম হয়ে ফুড়ে ওঠে, আরো রাত্রি চায়
মাথা উঁচু, উঁচু, আরো উঁচু পর্যাপ্ত অধিকারের ভেতর
প্রলম্বিত আকর্ষণ, ডাকে, অমন্ত্রণার মুক্ত অক্ষরের যদি আয়োজন হয়

স্ক্রিপ্ট

বিশ্বজিৎ রায়

রঙ-বেরঙের অনেক ছবি আঁকা হল,
মেঘের কালো সরিয়ে
এঁকে দেওয়া হল ফুটফুটে আলো,
নামহীন ঝর্ণাগুলোর শরীরে

লেখা হল নতুন নাম।
গান শোনানো হল রাতভোর, ইকো হল,
ছেঁড়া পোশাকগুলো খুলে
পরিয়ে দেওয়া হল নতুন পোশাক, তারপর...

মাঠে ঘাটে ঘুরে
চাষীদের বোঝানো হল—
এবার তোমাদের রাজা হওয়ার পালা।
তোমাদের কাছে থাকবে সিন্দুকের চাবি,
তোমার সন্তানের কাছে থাকবে এটিএম কার্ড, মোবাইল,
ফট্‌ফট্ করে ইংরাজি বলবে,
মোটরগাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াবে তোমরা
পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত—

'স্ক্রিপ্ট' শেষ হওয়ার পর চাষীরা চোখ মেলে দেখল—
সব রঙ উধাও, সব চাষী, ঝর্ণা জলের অতলে,
চারপাশে পড়ে আছে শুধু
রাশি রাশি কালো কার্বন আর হিমোগ্লোবিন...

বসন্তবাহার

ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়

মুহূর্তটি :
দিন একলা
রাত একলা
একলাই এই বসন্ত
স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়...
মুহূর্তটি চলমান
মুহূর্তটি স্থিরমান
জীবনকে অতিক্রম করে

মৃত্যুকে অতিক্রম
সংসারবৃক্ষ
ঊর্ধ্বমূল সম্পন্ন, অধঃশাখা সম্পন্ন
ফুলে ফুলে ফলে ফলে মহিমান্বিত সৌরভ

আমি তো সামান্যমাত্র
ওই মুহূর্তটিতে অবস্থান করছি
অবস্থান অতীত
বর্তমান
ভবিষ্যৎ

বিষের সোপান

চন্দ্রচূড় সরকার

কীটেদের সংসারে আজ নীল স্রোত বয়।
সব প্রায় মৃত,
কয়েকটা তবু—
সদ্য ডিম-ফোটা
এদিক-ওদিক চায়
বেঁচে থাকবার পথ খুঁজে—
তারা ধীরে অন্যান্য অনাথের মতো
বড় হতে থাকে
মানুষের শস্যের মূলে।

এরকম সংঘর্ষে হঠাৎ আকাশ থেকে
পড়ে যায় কয়েকটা সাধারণ পাখি।
আমি এসব—এই জমির প্রান্তে একা
অস্বচ্ছ চোখ মেলে দেখি।

মানুষেরা এরকমই চেয়েছিল
তাদের চাষের কথা ভেবে,
মানুষেরা এরকম বড় হয়েছিল
অন্যসব শবের সোপানে।

গলি থেকে রাজপথ

বিকাশ মণ্ডল (দ্বিজ)

এ গলি,
ও গলি,
এ পথ,
বেপথ—
হামাগুড়ি, হেঁটে, সাঁতরে
তবে এখানে এসেছি;
তারপর তোমায় পেয়েছি।
তুমিও নাকি
আমার মতো
বহু পথ পুড়িয়ে
তবে এখানে এস্‌ছো!

সামনে দিয়ে যখন
এসেছি, ঝুলি উলটে
দিয়েছি ভালোবাসা।
শুধু পেয়েছি লেলিহান যন্ত্রণা,
নারকীয় ঘৃণা।
আজ পেছন ফিরে দেখি
তারাই দুই বাহু, সমগ্রদেহ
নিয়ে বুভুক্ষের মতো
চেয়ে আছে।

পেছনে ফেরা তো সভ্যতা নয়,
আমরা দু'জন সর্বহারা
এগিয়ে যাব সামনে—
কারণ আমাদের বড় রাস্তায়
উঠতে হবে।

কাল সারারাত

অঞ্জন কর

জলের সমস্ত রং মুছে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়
কার্পাস তুলোর মতো ছড়ানো মিছিলে
তীরে বাঁধা নৌকাগুলো কেঁপে ওঠে শুধু
যত দূরে যাই, তাকে গেঁথে রাখে, শস্য ভরা মাঠ
উর্বর বুকের কাছে, দৃশ্যপট নির্বাপিত হলে
হাল ভাঙা গতিপথে, অর্ধশয়ান
আলস্য মিথুন

এই তার খেলা, বসন্তের নীল কৌতুহলে
ঝড় থেমে যায়, বাতিঘর অবিরল ভাবে
চেয়ে থাকে, পূর্ণিমার
জ্যোৎস্না বিছানো সেই ঘরে
আমাদের কিছু কিছু ভালবাসা যেখানে সাজানো
স্তরে স্তরে, এখনো যা আছে
ফলভারে নম্র সেই বিভা, মধুর শরীর
কেঁপে কেঁপে শান্ত হয়ে যায়
জলের সামান্য কাছে, সার সার পল্লবিত মূলে
ঢেলে রাখি অঢেল সবুজ, শস্য বীজ

কাল সারারাত, সমুদ্রের পিচ্ছিল প্রবাহ আর বিবরণী মেঘ
তাকে সমৃদ্ধ করেছে
ঠিক তার আগে, আমি সন্তর্পণে
দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে যাই
যাব অযোধ্যা পাহাড়ে
কাঠ কাঠ মাটি আর শূন্যতার কাছে!

দাগ

অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল

শুধু ছায়া পড়ে বুকে
আর সব থাকে নিরুদ্ভাস।

ঢেউ প্রবাহ মুছে গেছে
আছে শুধু স্মৃতির বালুকণা।

আঁধার যবনিকা তলে শুধু
জেগে থাকে প্রদীপের উদ্ভাস।

মন থেকে মুছেছে মুখ
মুখোসটুকু কঙ্কাল সার।

তুলির আঁচড় নেই আর
উড়ছে শুধু হিজিবিজি দাগ।

নিঃশেষ হল কালি কলম
ধমনিতে জাগে রক্ততিলক।

বৃষ্টি

দিশা চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি, অভিমানকে চুরমার করেছে
বারবার—

জলের মধ্যে শরীর নড়ে উঠলে
আমি ছবি আঁকি ছায়ার
কৃষ্ণচূড়ার রঙ আঁকতে আঁকতে
কয়েক শ্রাবণ পার করে দিই মুহূর্তে...

অদ্ভুত এক বৃষ্টি হাতছানি দেয়
রঙ থেকে মুছে যায় রঙ!

অবাধ্য ক্যানভাস শুধু রঙ চষে যায়—
ঘন বৃষ্টির ভেতর হেঁটে গেছি
এতকাল...

মাত্র একদিন তোমার সঙ্গে
বৃষ্টিতে ভিজতে চেয়েছি

তোমার ঠোঁটে আঁকি, আষাঢ়ের মুখ...

তুমি যদি নদী হতে চাও
ফিরে যাও জলের গভীরে—

আমার চোখের পাতায়
শ্রাবণ আঁকতে আঁকতে

ভাবি এভাবেই হয়তো একদিন
তোমাকে ভেজাব অমোঘ বৃষ্টি জলে!!

বিধিভঙ্গ

নীলাঞ্জন কুমার

নিকুচি করেছে বিধির : সর্ষের ভূতেরা
খায় দায় দই ননী মজা করে;
এদের কি ভাগ্য? এরা সব সেবাদাস হয়ে
মাঝেমধ্যে নেচে-কুঁদে গেয়ে যায়
বিধির মাহাত্ম্য। বিধির ভেতরের ভয়
জয় করে নেয় তুখোড় সকলে।

বিধিভঙ্গে বেশ মজা, সবাই তাকিয়ে দেখে
বীর ভেবে। নিপুণ গরিমা নিয়ে সমাদর চায়
পাড়ায় পাড়ায়।

নিকুচি করেছে বিধির : সর্ষের ভূতেদের কাছে
শিখে নেওয়া যাক বিধিভঙ্গের তত্ত্বকথা।

বাজার

বনানী দাস

বাজার বাজার মস্ত বাজার
বাজার মানেই হাজার
বাজার মানেই বিকিকিনি
দেখানো জোর মাজার
বাজার বাজার মজার বাজার
বেশিরভাগই ব্যাজার
বেশিরভাগকে ব্যাজার করেও
বাজার—
দু-চারজন রাজার!
রাজার হাঁকেই বাজার ওঠে
রাজার ডাকেই পাতাল
কিনব কিনব নেশার চোটে
ক্রেতার দল মাতাল
আয়ে ব্যয়ে মস্ত ফারাক
ভাগ্যের কি হাসি
বাজার চলে রমরমিয়ে
সামনে—
বিজ্ঞাপনের বাঁশি!!

রবীন্দ্রনাথ তুমি

প্রজ্ঞানন্দ আচার্য

আমার চলার পথে তুমি একটা বটগাছ।
অসংখ্য ঝুরির আড়ালে রহস্যাবৃত
মাটি আর আকাশের সম্বন্ধটাকে ধরে রেখেছ।
তোমার যেটুকু ছোঁওয়া যায় তাকে ওরা মার্বেল দিয়ে বাঁধিয়েছে।
কোনও এক দিব্যপুরুষের কোলে শিশুর মতো আমি
সেখানে বসি, দেখি কত পাখি তোমার ফল খাচ্ছে
কিন্তু তুমি তাদের শরীরে বাসা বাঁধছ না।
তারাও ভার বইতে পারছে না,
ঠিক পৃথিবীর আত্মার সাথে যেখানটায় তুমি
মিশে আছো। তার থেকে অনেকটা দূর
কোনও এক পরিত্যক্ত বাড়ির কার্নিশে অথবা
সহদেবের চায়ের ঠেকের ছাউনিতে
আবার জন্মাচ্ছো তুমি। সেই শক্ত শিকড় নিয়ে
কংক্রীটের দেওয়াল ফাটিয়ে
মাটির সাথে মেশো তুমি।
মাটির সাথে তোমার সম্বন্ধ
সেই কোন কাল থেকে। প্রথম সূর্য উঠল
যেদিন—এসব তো বোটে বসে লিখেছিলে।

একটা খোলা জানালা দিয়ে
চৈত্রের দুপুরে শুয়ে শুয়ে তোমাকে দেখি
চিরসবুজ ডালপালা নিয়ে তুমি খাঁ খাঁ করছো আকাশে
আমি ঘুমিয়ে পড়ি তারপর সকালের শীতে
লোমকূপ খাড়া করে তোমার কাছে যাই।
দেখি দুটো টুনটুনির উষ্ণতা বিনিময় আর
একা তোমাকে।

চিরনতুনের ডাকে

সোমনাথ কর

চির নতুনের ডাকে ভরে উঠুক শাশ্বত জীবন।
দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হোক তোমার বাণী।
প্রভাতের রবিরেশে ভরিয়ে দিক মোদের প্রাণ।
দৃপ্তময় পদধ্বনি মুছে দিক জাগতিক সকল গ্লানি।
তোমার পরপদকমলে আছি আমরা
আশ্রয় দাও। শান্তির নীড় তুমি। পবিত্র ভাষা তোমার।
হিংসার প্রজ্বলিত শিখায় হিমেল পরশ দাও
রাঙা আবিরের মনময়তায় দূরে সরে যাক,
বিভেদ রক্তের হানাহানি।
গুরুদেব তুমি।
তোমার পদতলে জাতির অধিষ্ঠান।
চির নতুনের ডাকে,
আর একবার হিরণ্ময় বেশে, তুমি জন্ম নাও এই বাংলায়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত

বিশ্বজিৎ বাগচী

মন্ত্রমুগ্ধের মত গাঢ় হলে ছবি
জেগে ওঠে অবয়ব সাধারণ
যেন এখনি সে স্নান করতে যাবে
টাওয়েল অন্তর্বাস গোছানোর পর
প্রতিবিম্ব অন্তর্লীন খুশীর উৎসবে
আকাশের রঙ পালটে দিল।

এখন তো অন্য কেউ অপেক্ষায়
এখন তো অন্য ক্রিয়া শুরু হবে বলে
সে দু বিনুনী বেঁধেছে। সাঁকোটিতে
খুব রঙীন উচ্ছল আলো মাখামাখি

বাড়ির সামনেই মেন রোড। তবু সব
গাড়িগুলি শব্দহীন সরে যায়, ওইখানে
হ্রদ হবে, পদ্মফুল ক্লিশে হয়ে গেছে বলে
একখানি দ্বীপ হবে, সেই দ্বীপে একটাই নীলবাড়ি
পছন্দের সঙ্গীর সাথে হুটোপাটি জলে।

একটি কবিতা লেখা হলে
তোমার মনের ভিতর আমার ঘোরাফেরা,
সংসারে প্রান্তিক অনুভব।

গানের সংসার

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

তুমি যখন গান দিয়েছিলে
তখন আমি দূরে কোথাও
নীল সমুদ্রের দ্বীপে...
যখন আমার ডাক আকাশছোঁয়া
তুমি তখন পারাপারের সাঁকোর ওপর;
তলায় ঘুমন্ত জল, শুভদৃষ্টির
বোবাফুল নিঃসঙ্গ ভেসে যায়,
গায়ে হাওয়া নেই, থেমে আছে শুধু!

সাঁকোর ওপর তোমার-আমার
দু'জনের ছায়া স্ট্যাচু হয়ে এক ঠায়
আমাদের সেই সুদীর্ঘ দিনপাতের
প্রিয়তম গানে-গানে পরিচয়
গানে-গানেই কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা
আপনার গানের সংসারে!!

তোমার ছায়া

মৃণাল বসুচৌধুরী

পদ্মপাতার জলে যখন লুকিয়ে থাকে সুখ
যখন বিষাদ মধ্যযামে দেখায় ছায়ামুখ
যখন রোদে বৃষ্টি ঝরে
হঠাৎ শুভ্র কেতন ওড়ে
বুঝতে পারি সৃষ্টি তোমার
ডাকছে কাছে 'আয়'
স্বপ্নঘুমে তোমার ছায়া
বিশাল দীর্ঘকায়

নাগরিক সুসভ্যতা

কৃষ্ণা বসু

দূরের শহর থেকে পাঠিয়েছ রাত্রিজল, ঘনমায়া, তীব্র গাঢ় আলো;
মফঃস্বলবাসিনীর মন কেঁপে ওঠে এই সুসংবাদে!

শহরে অনেক কিছু পাওয়া যায়, ট্রাফিক সিগন্যাল,
মনুমেন্ট, মায়ানারী, পণ্য সুসভ্যতা,—
সে সব চিঠিতে লেখে, এস.এম.এস. করে তুখোড় যুবক।
গ্রামীণ মেয়েটি কাঁপে ভয়ে।
ততটা গ্রামীণ নয়, মফঃস্বল ঢুকে গেছে রক্তের ভিতর।

দূরের শহর থেকে পাঠিয়েছ শুভেচ্ছা সংবাদ,—
মফঃস্বলী মেয়ে পেয়ে খুশী হও নাগরিক যুবা।

এইভাবে নাগরিক সুসভ্যতা গ্রাম গ্রাস করে।

১ মার্চ রবিবার এক বর্ণময় অনুষ্ঠানে যুক্তিবাদী সমিতির ২৫তম জন্মদিন পালিত হল। বেশ কয়েকটি বাংলা ও হিন্দী পত্রিকায় খবরটি ছবিসহ ছাপা হয়েছে। 'প্রতিশ্রুতি' পাক্ষিক থেকে নিচে দেওয়া হল খবরটি।

যুক্তিবাদী সমিতির ২৫-শে পা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ মার্চ আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস এবং যুক্তিবাদী সমিতির ২৫তম জন্মদিন পালন করল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। যুক্তিবাদী সমিতির আর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার নেই। কারণ, যুক্তিবাদী সমিতি বা প্রবীর ঘোষের নাম শুনলে আজ যে কোনও অলৌকিক ক্ষমতার দাবীদার বা জ্যোতিষী, বাবাজী, মাতাজীদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। এছাড়া প্রবীর ঘোষের লেখা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' এবং প্রবীর ঘোষ—এই তিনে মিলেমিশে গড়ে উঠেছে 'যুক্তিবাদ'। যুক্তি মানুষের জীবনে প্রতি মুহূর্তে অক্সিজেনের মতো প্রয়োজনীয়। কারণ, কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন যুক্তি, রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, শিক্ষা যে কোনও ক্ষেত্রে যুক্তিই পথ দেখায়।

গত ১ মার্চ কলকাতার রামমোহন মঞ্চে ঠিক সন্ধে ৬ টায় অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন সুদীপ চক্রবর্তী, উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বনানী দাস। এরপর যুক্তিবাদী সমিতির '২৫শে পা প্রসঙ্গে' কিছু কথা, কিছু স্মৃতি তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রবীর ঘোষ এবং সভাপতি সুমিত্রা পদ্মনাভন। অনুষ্ঠানে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে 'র‍্যাশনালিস্টস অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মান জানানো হয় গায়ক পল্লব কীর্তনীয়া ও শিক্ষাবিদ ড: সরোজমোহন মিত্রকে। পল্লব গান গেয়ে মুগ্ধ করলেন উপস্থিত দর্শকদের। এরপর যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী বিপ্লব দাসের লেখা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বইটি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীর হাত দিয়ে উদ্বোধন করা হয়। বইটি বিভাসবাবুর হাতে তুলে দেন দেজ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুভাষচন্দ্র দে। এরপর 'www.prabirghosh.com' একটি নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন বিভাসবাবু। এটি প্রজেক্টারের মাধ্যমে বড় পর্দায় দেখানো হয়। প্রবীর ঘোষ ডট কম-এর তথ্য সঙ্গে পল্লব কীর্তনীয়ার 'আলোমানুষ' গানটি এবং যুক্তিবাদী সমিতির আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন টিভি মিডিয়া যে প্রোগ্রাম দেখিয়েছে তার কিছু অংশ যেমন আচার্য সত্যানন্দ, বাবা রামদেব, উত্তাল মণিপুর

ও অন্যান্য। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায় ছিল শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্রের নাটক 'আত্মপক্ষ'—প্রধান ভূমিকায় ছিলেন গৌতম মুখার্জী। সব মিলিয়ে জমজমাট ছিল যুক্তিবাদী দিবস ও যুক্তিবাদী সমিতির জন্মদিন এর অনুষ্ঠান।

এবারে যাঁরা 'র‍্যাশনালিস্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত হলেন

ড. সরোজমোহন মিত্র

সরোজমোহন মিত্র ৮২তে পা দেওয়া এক তরুণের নাম। আমরা যুক্তিবাদী সমিতি আজ তাঁর সারা জীবনের কাজকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট র‍্যাশনালিস্টস অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করব।

আমরা তাই দেখি—প্রচারমাধ্যম যা দেখায়, যাকে ফোকাস করে। আর তারপর তিনিই আলো ঝলমল চরিত্র হয়ে ওঠেন। আমাদের চোখে সেলিব্রিটি হলেন সিনেমা জগতের তারকারা, ক্রিকেটার, মন্ত্রী ও সোনিয়া গান্ধির মতো 'কিং মেকাররা'। বিজ্ঞানী বা অধ্যাপকদের জন্য আমাদের দেশের মিডিয়া ক্যাসেট বা নিউজপ্রিন্ট খরচা করতে অনিচ্ছুক।

আমরা যুক্তিবাদীরা কিন্তু গড্ডালিকায় গা ভাসাই না। তৈরি আবেগের ফাঁদে বন্দি হই না। তাই আমরা আমাদের সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্মান জানিয়েছি বিকাশ সিংহ, সরোজ ঘোষ, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, তারকমোহন দাসের মতো বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের। ইতিপূর্বে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে আমরা সম্মান জানিয়েছি।

'সরোজমোহন' এমনই একজন মানুষ যিনি একাধারে আদর্শ অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ও সমাজ সংস্কারে নিবেদিত প্রাণ।

জন্ম ১৯২৭ সালের ১ জুন বাংলাদেশের নোয়াখালিতে। নিজ পরিবার প্রতিষ্ঠিত স্কুল থেকে ম্যাট্রিক। ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন ছাত্র জীবনে। তখন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে আকর্ষিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও চৈতন্য কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা নির্দেশক।

এইসব দিয়ে মানুষ সরোজমোহনকে চেনা অসম্ভব। অধ্যাপক সরোজমোহন, লেখক সরোজমোহন, সমালোচক সরোজমোহনকে ছাপিয়ে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি রামমোহন রায়ের প্রকৃত উত্তরসূরি।

আজকের ব্রাহ্মরা যখন রামমোহনকে ত্যাগ করে ভাগ্যবিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্রে ও দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন তখন ব্রাহ্ম না হয়েও সরোজমোহন

তাগা-তাবিজ-ভাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কুসংস্কারকে ছেঁটে ফেলেছেন তাঁর নিজের জীবন থেকে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের মতোই আপোসহীন সংগ্রাম করে গেছেন। রামমোহন লাইব্রেরি থেকে জ্যোতিষ সংস্থার পঠন-পাঠন চালাবার প্রক্রিয়াকে তিনি উৎখাত করেছেন এই তো বছর তিনেক আগে। তখন তিনিই ছিলেন রামমোহন লাইব্রেরির সভাপতি।

জাত-পাত, নারী-পুরুষ বৈষম্য, প্রাদেশিকতা ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থাকা উচ্চশির এই শিক্ষাবিদ, লেখক, সমালোচক, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী এমন অসাধারণ মানুষটিকে 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট র‍্যাশনালিস্ট অ্যাওয়ার্ড' নিয়ে সম্মানিত করতে পেরে মনে করছি আমরা আজ নিজেদেরই সম্মানিত করলাম।

পল্লব কীর্তনীয়া

পল্লব কীর্তনীয়া একজন গায়ক। সমাজ সচেতন, আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করা একজন গায়ক। অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক মানুষ। বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁকে আমরা দেখেছি দীপ্ত কণ্ঠ ও চওড়া কাঁধ নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষদের পাশে তাঁকে আমরা দেখেছি। বিহারের শব্দগাঁও একটি স্বয়ম্ভর গ্রাম। সেই গ্রামের 'আলো ও মানুষ' নিয়ে একটি তথ্যচিত্রময় গান বা সংগীতময় তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন পল্লব।

পল্লব রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন সুমিত্রা সেন ও মায়া সেনের কাছে। উৎপলেন্দু চৌধুরীর কাছে লোকগীতি ও রজত মিত্রের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর শিক্ষা লাভ, টিভি সিরিয়াল ও বড় পর্দায় তিনি অভিনয় করেছেন।

জন্ম ১৯৬৪ সালে। ছেলেবেলা কেটেছে উত্তর ২৪ পরগনার ইছামতির তীরের এক গ্রামে। এরপর স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলকাতায় পড়তে আসা। প্রথমে গোয়েঙ্কাতে কমার্স নিয়ে ভর্তি হওয়া। মন ভরলো না। কমার্স ছেড়ে সায়েন্স নিয়ে পড়া শুরু করলেন। তারপর সায়েন্স ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানেও মন টিঁকলো না। মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে ভর্তি হলেন। তাও দু-মাসের জন্য। গ্রামে ফিরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনে, মিছিলে, পথসভায়, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে গলায় হারমনিয়াম ঝুলিয়ে গণসঙ্গীত গেয়ে কাটলো তাঁর অনেকগুলো দিন। আবার একসময় ডাক্তারী পড়তে ফিরে গেলেন। ১৯৮৮ সালে এমবিবিএস পাশ করলেন। ডাক্তার হলেন। কিন্তু ডাক্তারীতে মন বসলো না। রবীন্দ্রভারতীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে পড়া শুরু করলেন। ১৯৯৫-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলেন।

প্রথম গানের ক্যাসেট বেরলো প্যান মিউজিক থেকে ১৯৯৪ সালে।

গুজরাটের দাঙ্গাপীড়িত মানুষের পক্ষে পল্লব গান গেয়েছেন। পল্লব মমতার বিরুদ্ধেও গান গেয়েছেন। তখন শাসকদল পল্লবের গানের প্রশংসায় মুখর হয়েছে। এবার নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন পল্লব। ফলে পল্লবের গায়ে কারা যেন ছাপ্পা মেরে দিল পল্লব 'সিপিএম বিরোধী'।

গান মেলায় এতদিন গান গাওয়া পল্লব তাই এখন সরকারের কাছে ব্রাত্য। সরকারের বড় শরিকের কাছে ব্রাত্য।

না। আমরা 'সরকার বিরোধী' বা 'সরকার পক্ষের' মানুষ কিনা—বিচার করে 'র‍্যাশানালিস্ট অ্যাওয়ার্ড' দিই না। তাই আজ পল্লবকে 'Singer of the Year' হিসেবে 'র‍্যাশানালিস্ট অ্যাওয়ার্ড' তুলে দিচ্ছি।

পল্টুকে ভগবান দেখা দিলেন, বললেন—তুমি কি বর চাও?

পল্টু : স্যার, আমি যেন যখন যেখানে খুশী যেতে পারি। বাজারে গিয়ে বিনা পয়সায় যা চাই খেতে পারি, লোকে যেন আমায় ভয় করে, ভক্তিও করে, আমায় দেখলে সবাই যেন রাস্তা ছেড়ে দেয়। কন্যার পিতারা যেন আমার হাতে কন্যা সমর্পণ করে কৃতার্থ হয়। পুলিশও আমায় ছুঁতে ভয় পায়। গৃহিণীরা আমাকে ডেকে খেতে দেয়। আমার সন্তান-সন্ততি যেন সারা শহরে ছড়িয়ে থাকে। তারাও যেন দেবজ্ঞানে পূজা পায়।

ভগবান : তথাস্তু, তবে তাই হোক, যা তোকে ষাঁড় করে দিলাম।

—সৌম্যজিৎ 'জোকপট', আসানসোল

সমস্যা : আত্মহত্যা

ডা: প্রতনু সাহা (মনোরোগ বিশেষজ্ঞ)

আত্মহত্যা—অসুখ না অসুখের পরিণতি :

শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রে, আত্মহত্যার কারণ কোনো না কোনো মানসিক অসুস্থতা; যার মধ্যে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে বিষণ্ণতা রোগ (Depressive Disorders)। অন্যান্য মানসিক অসুখ যেমন, স্কিজোফ্রেনিয়া, মদ ও মাদকের নেশা, ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা (Borderline Personality Disorder) এবং উদ্বেগ-বৈকল্য, বাকি ২০ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ৫টির মধ্যে ৪টি আত্মহত্যার কারণ বিষণ্ণতা। যারা বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হন তাদের মধ্যে শতকরা ১০-১৫ জনের মৃত্যু হয় আত্মহত্যায়। সমস্যাটি হল যারা বিষণ্ণতায় ভোগেন তাদের অর্ধেকেরও কম কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, আর যারাও বা আসেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই সম্পূর্ণ নিরাময়ের আগে চিকিৎসা বন্ধ করে দেন।

সমস্যার ব্যাপকতা :

প্রথমে দেখা যাক গোটা বিশ্বে আত্মহত্যার পরিসংখ্যান।

* প্রতি বছরে এই গ্রহে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের আত্মহত্যায় মৃত্যু হয়।

* গত ৫০ বছর যাবৎ সারা বিশ্বেই আত্মহত্যার রেখচিত্র ঊর্ধ্বমুখী। শুধু তাই নয়, ৫০ বছর আগে বেশির ভাগ আত্মহত্যাকারীর বয়স ৪৫-এর উপরে থাকত, বর্তমানে বেশিরভাগেরই বয়স ১৫ থেকে ৪৪-এর মধ্যে।

* কৈশোরে আত্মহত্যার প্রবণতা দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী। এই বয়সে মৃত্যুর প্রথম ৩টি কারণের অন্যতম আত্মহত্যা।

* উন্নত বিশ্বে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে এবং জাপানে আত্মহত্যার হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। ক্যাথলিক দেশগুলোয় (যেমন ইটালি, স্পেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইজিপ্ট) মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম।

* ব্রিটেন, কানাডা এবং আমেরিকার অবস্থান আত্মহত্যার পরিসংখ্যানে মাঝামাঝি।

* মাঝামাঝি থেকেও গড়ে প্রতি ২০ মিনিটে একজন আমেরিকাবাসী আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বছরে প্রায় ৩০,০০০-এর বেশি আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু নথিভুক্ত হয় স্টারস এন্ড স্ট্রাইপ্স রঞ্জিত স্বপ্নের ভূখণ্ডে।

* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, শ্রীলঙ্কা এবং ভারতে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

এবারে আমাদের দেশের পরিসংখ্যানে চোখ ফেরাই :

* প্রতি ৫ মিনিটে ভারতে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে এবং প্রতি ৩ জন আত্মহত্যাকারীর মধ্যে একজনের বয়স ১৫-২৯-এর মধ্যে।

* প্রতি বছরে প্রতি এক লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে গড়ে ১১ জন আত্মহত্যায় মারা যান।

* কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ—এই ৪টি রাজ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবথেকে বেশি। সারা দেশের নথিভুক্ত আত্মহত্যার অর্ধেকই হয় এই ৪টি রাজ্যে। সম্প্রতি আমাদের রাজ্য এই তালিকার শীর্ষস্থানে।

* ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির রাজধানী বাঙ্গালোরে আত্মহত্যার ঘটনা সবথেকে বেশি। শুধু তাই নয়, ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে আত্মহত্যাকারী ১০ থেকে ১৪ বছরের কিশোর বা কিশোরী। ২০০১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী বাঙ্গালোরে আত্মহত্যার হার কলকাতা শহরের তুলনায় ২০ গুণেরও বেশি।

* কম বয়সে যারা আত্মহত্যায় মারা যান, দেখা গেছে তাদের মধ্যে অন্তত এক-তৃতীয়াংশে আগে এক বা একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, যে সমস্ত কিশোর-কিশোরী অন্তত একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে, আত্মহত্যায় অকালমৃত্যু ৩ ০ শতাংশ কমানো যায়।

প্যারাসুইসাইড (Parasuicide) :

প্যারাসুইসাইড বলতে বোঝায় সেই ধরণের আত্মঘাতী চেষ্টা যা সাধারণত জীবন কেড়ে নেওয়ার মতো সাংঘাতিক বা মারাত্মক নয় এবং ঠিক মৃত্যুর ইচ্ছা এর পিছনে কাজ করে না যদিও কিছুক্ষেত্রে মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। কমবয়সীদের মধ্যে বিশেষত কিশোরীদের মধ্যে এই আচরণ বেশি দেখা যায়। বস্তুত আত্মহত্যার গুরুতর (lethal) চেষ্টার তুলনায় এই প্যারাসুইসাইড অনেক বেশি দেখতে পাই। তোমরাও হয়তো তোমাদের পরিচিতবৃত্তে কারোর মধ্যে এরকম আচরণ দেখেছ। যারা এরকম আচরণ করে তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে, রাগে-দুঃখে-অভিমানে বা হতাশায় নিজের শরীরে আঘাত করে তারা সাময়িক স্বস্তি পায়। কেউ কব্জিতে ব্লেড চালায়, কেউ বা একটু বেশিমাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেয়। ক্রমশ এটা একটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। কোনো চিকিৎসা না হলে ভবিষ্যতে এদের মধ্যে অনেককেই আত্মহত্যার গুরুতর চেষ্টা করতে দেখা যায়। সমীক্ষায় জানা গেছে, যাদের মধ্যে প্যারাসুইসাইডের অভ্যাস আছে তাদের প্রায় ১০ শতাংশ

পরবর্তীকালে আত্মহত্যার পথেই মারা যায়। প্যারাসুইসাইডের পিছনে যে মানসিক অসুখগুলো সাধারণত আমরা পাই—ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা (Personality Disorders), পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার অক্ষমতা (Adjustment Disorder) ইত্যাদি।

কাদের মধ্যে আত্মহত্যার আশঙ্কা বেশি :

বয়স : ১৫ থেকে ৪৪-এর মধ্যে এবং ৭০-এর উপরে আত্মহত্যার হার বেশি।

লিঙ্গ : মহিলাদের মধ্যে প্যারাসুইসাইড বা আত্মহত্যার চেষ্টা (Attemped suicides) পুরুষের তুলনায় বেশি।

পারিবারিক বৈশিষ্ট্য : যে পরিবারে আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত রয়েছে সেই পরিবারের কমবয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য : যারা বন্ধুবান্ধবহীন, সামাজিক মেলামেশা যাদের কম, তাদের মধ্যে আত্মহননের দৃষ্টান্ত বেশি পাওয়া যায়।

মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

হতাশা (Hopelessness) : সাময়িকভাবে যে কোনো মানুষই হতাশ বোধ করতে পারে, বিশেষত খারাপ সময়ে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ মন হতাশায় ডুবে থাকলে আত্মহত্যার আশঙ্কা থেকে যায়। বিষণ্ণতাসহ অনেক মানসিক অসুস্থতায় মনে হতাশা আসতে পারে। আবার দীর্ঘকালীন শারীরিক অসুস্থতাও অনেক সময়ে মনে হতাশা তৈরি করে।

হঠকারিতা (Impulsivity) : আত্মহত্যা যারা করেন, দেখা গেছে, তাদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তাভাবনা করে তবে এই সিদ্ধান্তে আসেন। আবার কেউ কেউ, বিশেষত কমবয়সীরা মুহূর্তের চিন্তা থেকে হঠাৎ করে আত্মহত্যা করে বসে। হঠকারী মনোবৃত্তির জন্য এরা অনেক সময়ে সাময়িক আবেগের (ঘনিষ্ঠ কারোর প্রতি অভিমান, দুঃখ) বশবর্তী হয়ে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন সময়ে এদের আচরণে হঠকারিতার মনোভাব লক্ষ করা যায়। অনেক সময়ে হঠকারীভাবে কোনো দুঃসাহসী কাজ করে ফেলে বন্ধুমহলে এরা সাময়িকভাবে হিরো বনে যায়, আর তার ফলে আরও বেশি করে হঠকারী মানসিকতা পোষণ করে।

বেপরোয়া মনোভাব (Desperation) : মানসিক গঠনে নমনীয়তার অভাব থেকেও আত্মহননের প্রবণতা তৈরি হয়। অনেক সময়ে আমরা শুনে থাকি যে, বিশেষ কিছু আব্দার করে না পেয়ে কোনো কিশোর বা কিশোরী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আপাতভাবে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এমন আচরণের। জীবনে তো আমরা অনেক কিছুই পাই না, কিন্তু তার জন্য আমাদের জীবন থেমে থাকে না।

না পাওয়া জিনিসটাকে ছাড়াই আমরা জীবনের ছন্দে ফিরে আসি। যাদের চিন্তাভাবনায় একগুঁয়েমি বা মরিয়া ভাব থাকে তারা এভাবে ভাবতে পারে না। তারা দৃঢ়ভাবে ভাবতে থাকে যে ওই বিশেষ জিনিসটা ছাড়া তার জীবন অচল। এই ভাবনাকেই জীবনপণ করে আঁকড়ে ধরে। একবারও সহজ কথাটা ভেবে উঠতে পারে না যে, যেটা পায়নি সেটা ছাড়াই এতদিন সে হইহই করে বেঁচে ছিল।

রাগ ও হিংসা (Aggression & Violence) : নিজের আবেগের রাশ যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, আত্মহত্যার ঝুঁকি তাদের ক্ষেত্রে বেশি। তোমরা নিশ্চয়ই এমন কিছু মানুষকে দেখেছ যারা রেগে গেলে হিতাহিতবোধ হারিয়ে জিনিসপত্র ভেঙে ফেলেন বা অন্যকে মারধোর করেন। এদের মধ্যে হঠাৎ করে আত্মহত্যার ঝোঁক তৈরি হয় যখন রাগ করার মতো দ্বিতীয় কোনও মানুষকে পান না, নিজেকে ছাড়া। নিয়ন্ত্রণহীন রাগের সমস্যা যাদের থাকে ছোটবেলা থেকেই তা লক্ষ করা যায়।

ব্যর্থতা সহ্যের অক্ষমতা (Low frustration tolerance) : জীবনে কখনো কোনো কিছুতে ব্যর্থ হয়নি এমন মানুষ ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। ব্যর্থতার পরে আমাদের সাময়িক খারাপ লাগে ঠিকই কিন্তু সাধারণত তা কাটিয়ে আমরা আবার ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের তৈরি করি। সাফল্যের আশায় উদ্বুদ্ধ হই। কিন্তু সহ্যের ক্ষমতা যাদের কম ব্যর্থতার সময়ে তারা ভবিষ্যতের সফলতার সম্ভাবনাকে কল্পনা করতে পারে না। স্বভাবতই অল্প ব্যর্থতাতেই এরা হতাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে এই ব্যর্থতা মানেই তাদের জীবন ব্যর্থ, সুতরাং ব্যর্থ জীবনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার অর্থ কী।

হীনম্মন্যতা (Poor self-esteem) : যাদের নিজেদের উপরে আস্থা খুব কম, সংকটের সময়ে কোথাও ভরসা না পেলে তারা সমস্যাকে মোকাবিলা না করে পালানোর পথ হিসেবে আত্মহত্যার কথা অনেক সময়ে ভেবে বসে। নিজের প্রতি সম্ভ্রমের অভাব থাকায় নিজেকে আঘাত করতে মনে দ্বিধা হয় না।

এইসব মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায় ঠিকই, কিন্তু এমনটা কেউ ভেবো না যে, কারোর মধ্যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভবিষ্যতে সে আত্মহত্যা করবে।

তোমাদের যা করা উচিত :

✓ মনে রেখো আত্মহত্যা প্রায় সবক্ষেত্রেই মানসিক অসুস্থতার চূড়ান্ত পরিণতি। তাই বিষণ্ণতাসহ মানসিক অসুস্থতাকে চিনতে শেখো। শুধু চিনলেই হবে না, জরুরি ভিত্তিতে তার চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

✓ কারোর কথায় আত্মহননের ইঙ্গিত পেলে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তার কথা শোনা। মারাত্মক ভুল ধারণা অনেকের মধ্যে আছে যে, যারা আত্মহত্যার কথা মুখে বলে তারা আত্মহত্যা করে না আর যারা সত্যি আত্মহত্যা করে তারা আগে আত্মহত্যার কথা বলে না। ভীষণ ভুল কথা। জেনে রাখো, আত্মহত্যা করার আগে বেশিরভাগ মানুষই ঘনিষ্ঠ কারোর কাছে বা চিকিৎসকের কাছে তাদের আত্মহত্যার ভাবনা প্রকাশ করেন।

✓ নিজের চিন্তাভাবনায়, মানসিক গঠনে এমন কিছু যদি থাকে যা আত্মহননের সহায়ক তবে সচেতনভাবে সেগুলোর পরিবর্তনের চেষ্টা করো। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের মধ্যে আরও উন্নত করতে সচেষ্ট হও—যেমন, নিজের উপরে আস্থা রাখা, ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা, আবেগের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

✓ চারপাশের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকো না। নিজের প্রয়োজনের মেলামেশার বাইরে কিছুটা সামাজিক মেলামেশা বজায় রাখো। যে অঞ্চলে বাস করো সেখানে ন্যূনতম একটা সামাজিক ভূমিকা যেন তোমার থাকে। সম্ভব হলে, মাঝে মাঝে কিছু সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখো।

✓ চারপাশের পরিচিত মানুষের জীবনে শুধু নয়, গানে-কবিতা-গল্পেও নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করো। নিজের জীবনের পরিধিটা তখন অনেক বড় হয়ে যায়। ফলে ব্যর্থতা-হতাশায় সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার পরিসরটাও বড় হয়ে যায়।

✓ অবশ্যই ভালোবাসতে শেখো নিজেকে। সবথেকে বেশি ভালোবাসা বরাদ্দ রাখো নিজের জন্য।

✓ সবশেষে মনে রেখো, জীবনে সবকিছুরই কিছু না কিছু বিকল্প পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও কিছুরই বিকল্প জীবন নয়। জীবনের কোনও বিকল্প হয় না।

[সৌজন্যে : 'কৈশোরক' পত্রিকা দ্বিতীয় সংখ্যা]

হেঁট হয়ে গেল

"মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হল তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ওই সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২ এপ্রিল ১৯৩১

হিজড়েদের তোলা আদায় বে-আইনি

মানসী

আমাদের অনেক কিছু বিষয়ে ভুল ধারণা আছে। ভুলগুলো আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কারণ বেশিরভাগ মানুষ প্রশ্ন করেন না, বা প্রশ্ন করতে পারেন না। তাই যে ভুলগুলো খুব সহজেই জানা যেত, সেগুলো আর বুঝে উঠতে পারি না।

সেই কবে মানুষ ভয়কে জয় করতে ভগবানকে মাথায় চড়তে সুযোগ দিল, সেই গুজবটাই থেকে গেল। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও কত খেটেখুটে জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। তার নিট্ ফল আজও ভারতীয় সমাজে জিরো। জ্যোতিষচর্চার বহর দেখে দুঃখ হয়।

এতো হল বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কুসংস্কারের কথা। যেখানে মানুষের বিশ্বাসের সাথে আবেগ জড়িত। কিন্তু যেখানে আবেগ শূন্য, শুধুই ভুল জানা থেকে ভয়, এমনই একটি কুসংস্কারের কথা আজ বলব। কী সেই ভয়? ভয় কাদের? কেনই বা ভয় হয়?

হিজড়ে কারা? না নারী, না পুরুষ। উভয়লিঙ্গ—এটাই আমরা জানি। "ভাবপ্রকাশে বা বাহ্যিক গঠনে নারী-পুরুষ মিশ্রিত একটি রূপের নাম হিজড়ে। ওদের অভিশাপে মানুষের ক্ষতি হয়। ওদের রোজগার করার একটাই উৎকৃষ্ট সহজ ব্যবস্থা—বাচ্চা হলে বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা তোলা। যেটা সরকার অনুমোদন করে। এর জন্য ওদের লাইসেন্স আছে। ওদের খুব মানসিক কষ্টে জীবন কাটে।" —এইসব তথ্য সবইতো আপনার জানা। তাহলে লিখতে গেলাম কেন? আসলে আমাদের জানার মধ্যে অনেক ঘাটতি আছে। সেটা বোঝাতেই কলম ধরেছি।

আমরা আসলে হিজড়ে বলতে যা জানি ও যাদের দেখি, সেই জানা ও দেখার মধ্যে একটু ফাঁক আছে। রাস্তায়, ট্রেনে-বাসে আমরা যতজন হিজড়ে দেখি; এরা সকলে না পুরুষ না নারী নয়। অর্থাৎ আমরা যদি ১০০০ হিজড়ে দেখি তার মধ্যে খুঁজলে হয়ত ১ জন আসল হিজড়ে পাওয়া যেতে পারে যে কিনা শারীরিকভাবে না পুরুষ, না নারী। বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে এরকম হিজড়ে শতকরা হিসেবের মধ্যেও পড়ে না।

১ লাখে হয়তো ১টি জন্মায়—এটা ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়। জন্মগত শারীরিক যৌনপ্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মানো শিশুর সংখ্যা এতটাই কম।

ঠিক যেমন কারুর জোড়া শরীর, দুটো মাথা, তিনটে হাত ইত্যাদি। তেমনি জন্মগত যৌনপ্রতিবন্ধকতা নিয়েও কেউ কেউ জন্মায়। যৌনাঙ্গ বা স্ত্রী বা পুরুষের মতো লিঙ্গ বলে কিছু নেই। খুব বেশি হলে একটি ছিদ্র থাকে। তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন আসছে, এই বিপুল সংখ্যক হিজড়ে গোষ্ঠির মানুষ—এরা কারা?

উত্তর : প্রথম, এরা বেশিরভাগ ছদ্মবেশি পুরুষ বা নারী।

দ্বিতীয়ত, মানসিক অসুস্থতার শিকার।

মানসিক অসুস্থ হিজড়ে :

এরা দু'রকম হতে পারে। ১) শারীরিকভাবে ছেলে কিন্তু মানসিকভাবে মেয়ে। এবং ঠিক উল্টোটাও হয়। তাই আমরা পুরুষ হিজড়ে ও মেয়ে হিজড়ে বলে থাকি।

আসলে এরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক যৌনাঙ্গ বিশিষ্ট নারী অথবা পুরুষ। শিশুকাল থেকে পরিবার-পরিবেশের প্রভাবে শরীরে পুরুষ হয়েও কথা বলার ধরন, হাঁটাচলা, মেয়েদের মতন হয়ে যায়। মেয়েদের মতো পোষাক, সাজগোজ করতে ভালবাসে। এরা মানসিকভাবে নিজেদের মেয়ে ভাবতে বেশি ভালবাসে। এই ধরনের হিজড়েদের 'আকুয়া' বলা হয়। অনেক সময় 'জেনানাও' বলা হয়ে থাকে।

একইভাবে শরীরে নারী কিন্তু স্বভাবে পুরুষের মতো যারা তাদের 'ছিন্নি' বলে। এরা সংখ্যায় কম।

ছদ্মবেশি হিজড়ে :

মানসিক অসুস্থ হিজড়ের থেকে ছদ্মবেশি হিজড়ের সংখ্যা অনেক বেশি। এরা প্রত্যেকে সক্ষম লিঙ্গবিশিষ্ট পুরুষ। শুধু রোজগারের ধান্দায় বা বিকৃত কামনা থেকে হিজড়ে গোষ্ঠীর সাথে মিশে থাকে, ওদের মহল্লায় বাস করে।

এখন নিশ্চই জানতে ইচ্ছে করছে তাহলে এদের শরীরের ওপরের অংশ মেয়েদের মতো হয় কি করে।

উত্তর : ১) স্বাস্থ্যবান পুরুষদের যদি ব্লাউজ, সায়া, শাড়ি পরিয়ে দেন, তাহলে শরীরের গঠন মেয়েদের মতো দেখতে লাগাটা খুবই স্বাভাবিক।

২) যারা রোগা-পটকা ছেলে, ছদ্মবেশ ধারন করতে, কৃত্রিম স্তন ব্যবহার করে পোষাকের তলায়। আর ভাবগুলো একটু নাটকের মতো করে প্র্যাকটিস করে রাস্তায় ধান্দায় নেমে পড়ে। অনেকটা যাত্রাদলের নারীবেশধারী পুরুষদের কায়দায়।

হিজড়ে সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান ও পেশা :

আগেই আলোচনা করা হয়েছে এরা বেশিরভাগই ছদ্মবেশি অথবা মানসিকভাবে অসুস্থ। তবে ছদ্মবেশির সংখ্যা বা প্রভাবই বেশি। দেখবেন এরা ট্রেনে, বাসে, বাজারে, বড় বড় সোনার দোকানগুলোতে একরকম তোলাবাজি করে টাকা

WEST BENGAL POLICE DIRECTORATE
PUBLIC GRIEVANCE AND ASSISTANCE OFFICE
WRITERS' BUILDINGS(GROUND FLOOR),
Post Box No. 426
Telephone No.214-5411 to 15, Extn.383
Kolkata-700001.

Serial No. 941 Part I

Memo No. 5062 Adm/C Dated -
PG & AO 4/03

To
The

Enclosed please find a copy of the Public Grievance Petition/Suggestion appeal filed by Shrimati Chabi Bhattacharya of Jirat Road, Habra Dist.North 24-Parganas.

The Grievance/Suggestion appeal is about complaints of Smt.Chabi Bhattacharya regarding humiliation by eunuchs.

You are requested to please take appropriate action from your end as advised in Serial number 8 & 9 of Annex-A(Part-I) of Home(P&AR) Departments Circular No. 1038(150)PGAR(AR) dt. 23/12/98 issued by the Chief Secretary, Govt.of West Bengal and send a report on action taken.

Sd/-
(S.Biswas)
Asstt.Inspector General of Police(S)
& Officer-in-charge PG & AO.

Sl.No. 941 Part No. I Memo No. 5062/1(2) Adm/C Dt. PG & AO-3/03

Copy forwarded to :-

1. Shrimati Chabi Bhattacharya of Jirat Road, Habra Dist.North 24-Parganas for information with reference to his/her petition dated

2. The PG & AO, West Bengal, Writers' Buildings, Kolkata-700001 for information with reference No. 39-P.C. /IGA/Home dt. 15.9.03

3. Dy.Secretary/Asstt.Secretary, Home(Political) Deptt. West Bengal, PG & AO,Writers' Buildings, Kolkata-700001 for information with reference No. P(PGAO) dated-

(S.Biswas)
Asstt.Inspector General of Police(S),
& Officer-in-charge, PG & AO.

AB/30.9.03

[illegible]

তসলিমা প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষের একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার

'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, বাংলাদেশ'-এর সম্পাদক অনন্ত বিজয় দাশের নেওয়া সাক্ষাৎকারের একটি অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।

প্রশ্ন : তসলিমা, কবির সুমন, অপর্ণা একাধিক বিয়ে করেছেন। বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখেন? ওঁরা কি আপনার চোখে যৌনউচ্ছৃঙ্খল?

প্রবীর ঘোষ : বিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। চিরস্থায়ী বন্ধন নয়। মনের গরমিল বাড়লে বিচ্ছিন্ন হওয়াই সুস্থতার লক্ষণ। তারপর আর বিয়ে করা চলবে না—এমন তালিবানি ফতোয়া জারি করার অধিকার সন্তান, আত্মীয় বা সমাজের নেই।

যাদের জীবন যতবেশি গতিশীল, উত্থান-পতন বেশি, তাদের জীবনে কর্মসূত্রে নতুন নতুন বন্ধু আসবে যাবে। এমন অবস্থাকে তো আমরা কখনই অনৈতিক বলে চিহ্নিত করি না। তবে কেন নতুন করে বিয়ের ব্যাপারে আমরা এতটা গোঁড়ামি দেখাব? মনের অমিল থেকে, অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে মানতে না পারার কারণে বিচ্ছিন্ন হলেও তারপর জীবনে নতুন কেউ এলে নীতিগত ভাবে আমি স্বাগত জানাব। এই অবস্থাকে আমি যৌনউচ্ছৃঙ্খলতা বলব না।

যৌনউচ্ছৃঙ্খলা একটা অন্য বিষয়। কেউ বিয়ে না করে অথবা একটিমাত্র বিয়ে করেও সারাটা জীবন উচ্ছৃঙ্খল থাকতেই পারে।

আপনি কারও প্রসঙ্গ টানলে তাঁর জীবনযাপন প্রণালী দেখেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। অবশ্যই পারবেন।

প্রশ্ন : নারীবাদী আন্দোলন ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিমোন দ্য বোভোয়া। তাঁর সঙ্গে জাঁ পল সার্ত্রের বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক ছিল। 'দ্যা ডেঞ্জারাস লিঁয়াজো' বইটি থেকে আমরা জানতে পারি, জাঁ পল সার্ত্রে ও সিমোন দ্য বোভোয়া তাদের ছাত্রী ও ছাত্রদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়তেন বা গড়তে বাধ্য করতেন। এমন কী সার্ত্রে তাঁর ছাত্রদের পাঠাতেন বোভায়ার সঙ্গে মিলনের জন্যে। বিনিময়ে বোভোয়াও তাঁর ছাত্রীদের পাঠাতেন সার্ত্রের কাছে।

সেই সময়কার অনেক লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা ওঁদের বিরুদ্ধে নষ্ট চরিত্রের অভিযোগ এনে ছিলেন। কিন্তু নারী স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন ও চেতনামুক্তির অভিযাত্রায় সিমোন দ্য বোভোয়া আজ প্রাতঃস্মরণীয়।

তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে আমরা ইতিহাসের পূর্বতন ধারা অনুসৃত হতে দেখছি। অর্থাৎ নারীর স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ণ ও চেতনামুক্তিতে তসলিমা নাসরিনের ব্যক্তিগত চরিত্র অনেকের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেন এমনটা হবে? এ কী ধরনের নিরপেক্ষ মানসিকতা?

প্রবীর ঘোষ : এই বঙ্গে এমন অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক ছিলেন ও আছেন, যাঁদের ব্যক্তিজীবন ও সৃষ্টি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি। বিদ্রোহী কবি নজরুল থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেজ থেকে কবির সুমন ব্যক্তিজীবনে যতই উচ্ছৃঙ্খল হোন না কেন, তাঁদের সৃষ্টিতে তার কোনও প্রতিফলন হয়নি।

তসলিমা এঁদের কারও মতো নন। তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও সৃষ্টিতে উচ্ছৃঙ্খলতা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। তাঁর বহু লেখা পড়েই আমার মনে হয়েছে, নিজের প্রতি নিজের কোনও সম্মানবোধ নেই। এ এক আত্মহননের প্রক্রিয়া। মানুষকে আত্মহননের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার এক প্রক্রিয়া।

ভাই, আপনি সার্ত্রে ও বোভোয়ার সঙ্গে তসলিমার যে প্রসঙ্গে তুলনা টেনেছেন, সেখানে একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। বোভোয়া বা সার্ত্রের জীবনে যত উচ্ছৃঙ্খলা ছিল, তা সবই তাঁদের ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ। তাঁদের সৃষ্টিতে তা নগ্ন রূপ পায়নি। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি অবশ্য তাঁদের বা অন্য কারও ব্যক্তিজীবনের যৌন উচ্ছৃঙ্খলা বা বহুগামীতাকে সামান্যতম সমর্থন করছি না। বরং নিন্দা করছি। এই নিন্দনীয় কাজের চেয়ে তসলিমার কাজ বহুগুণ বেশি নিন্দনীয়।

পুতুল নাচের পুতুল

জ্ঞান-বিজ্ঞান যত এগোবে, অজ্ঞানতার অন্ধকার যত দূর হবে ততই উপাসনা ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়বে। মানব প্রজাতির অগ্রগামীতার স্বার্থে মানুষ শোষণমুক্ত সমাজ চাইবেই। এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে রোধ করতে না পারলে শোষণমুক্ত সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিই শ্রেণি-বিভাজনের মেরুদন্ড।

এই দুই শক্তিকে টিঁকিয়ে রাখতে পারলে, শক্তিশালী করতে পারলে সাম্যচিন্তা ও তার প্রয়োগকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তাই আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপাসনাধর্ম ও ভোগবাদকে রাজনীতির শক্তিশালী হাতিয়ার করেছে। ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রচন্ডভাবে বেড়ে চলেছে পৃথিবী জুড়ে। ধর্মীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিতে ধর্মীয় নেতাদের

বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য তৈরি করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বাজারে। ধর্মোন্মাদ জনতা জেহাদ ঘোষণা করছে। ধর্মের জিগির তুলে ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, সিরিয়া, মিশর, প্যালেস্তাইন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশে দাঙ্গা থেকে যুদ্ধ সবই চলছে। বিশ্বায়নের ফলে ধর্মোন্মাদনা যত বিকোচ্ছে, ততই বিকোচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র। আর সাম্যচিন্তা দূরে সরে যাচ্ছে। শোষিত মানুষ ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যে যত লড়বে, ততই শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই শেষ হয়ে যাবে।

তসলিমা জেনে বা না জেনে বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদকে এককাট্টা করেছে, তীব্রতর করেছে। ফলে মুক্তমনের মানুষ আর ধর্মীয় মৌলবাদী মানুষ বিভাজিত হয়েছে। শোষণ মুক্তির জন্য শোষিত মানুষরা এককাট্টা হতে পারেনি। তসলিমা সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছেকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করেছেন।

তসলিমা ও তাঁর মৌলবাদ বিরোধিতা :

তসলিমাই কি বাংলাদেশের একমাত্র ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী লেখক? তাই ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধীতার কারণে তাঁকে বাংলাদেশ থেকে পালাতে হয়েছে জীবন রক্ষার তাগিদে?

ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। বাংলাদেশে যুক্তিবাদী, ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী বহু শ্রদ্ধেয় লেখক ছিলেন ও আছেন।

প্রায় ১৩০ বছর আগে জন্মে বেগম রোকেয়া ধর্মের নামে, পীরতন্ত্রের নামে নারী শোষণ ও অবদমনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। প্রায় ১১০ বছর আগে জন্মে আরজ আলী মাতুব্বর মুক্তচিন্তার পক্ষে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় মৌলবাদের বিপক্ষে গত কয়েক দশক ধরে কলম ধরেছিলেন বা ধরে আছেন আহমদ শরীফ, বদরুদ্দিন উমর, কবীর চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, আনিসুজ্জামান, সেলিনা হোসেন, সুরাইয়া বেগম, হাসনা বেগম, রশীদ করিম, নূরজাহান মুরসিদ, আশরাফ হোসেন, গোলাম মুরসিদ, হাসান আজিজুল হক, আবুবকর সিদ্দিকী, আইয়ুব হোসেন, ওয়াহিদ রেজা প্রমুখ। বাংলাদেশের এইসব মুক্তচিন্তার লেখকরা কেন তসলিমার পক্ষে সোচ্চার হননি?

তসলিমাই এ বিষয়ে তসলিমার সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। 'দ্বিখন্ডিত' গ্রন্থে তসলিমা ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের ধর্মগুরু হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে 'যৌনবিকৃত', 'ভন্ড' ইত্যাদি কিছু বাছা বাছা কু-শব্দ প্রয়োগ করলেন। কেন করলেন? কী যুক্তিতে করলেন—পাঠকরা জানতে পারলেন না। রেফারেন্স হিসেবে আমরা কিছুই পেলাম না।

তসলিমা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করলেন 'হাদিস'-এর নাম। হাদিস-এর কোন খণ্ডে কোন পৃষ্ঠায় আছে এমন কথা? সেই হাদিস গ্রন্থের প্রকাশক কে? না, তার

কোনও উল্লেখ নেই। এমন মন্তব্য করার বিষয়ে তাঁর এই সতর্কতার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। শুধু আবেগতাড়িত হয়ে দেশের একজন অতি জনপ্রিয় ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে কিছু লেখা উচিত নয়। লেখা যায় না।

আমিও এই বঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মীয় গুরু রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে লিখেছি। হ্যাঁ অতি ভয়ংকর কথাই লিখেছি। কিন্তু রেফারেন্স হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ 'উদ্বোধন' কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের কথা লিখেছি। সঙ্গে উল্লেখ করেছি কত তম সংস্করণ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থমালার মতো অতি জনপ্রিয় গ্রন্থে এ কথা লেখার পরও রামকৃষ্ণ ভক্তরা ক্ষেপে ওঠেননি। রামকৃষ্ণ মিশনও আমার বিরুদ্ধে ভক্ত ক্ষেপাবার চেষ্টা না করে পরবর্তী সংস্করণে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থ থেকে কিছু পৃষ্ঠাই উড়িয়ে দিয়েছেন।

তসলিমা কি তবে কুরআন, হাদিস না পড়েই ধর্মীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিতে চেয়েছিলেন? শেষ পর্যন্ত যদিও নিজের ফেলা থুতু নিজেকেই চাটতে হয়েছে। মহম্মদ বিষয়ে তাঁর মন্তব্যকে দ্বিখণ্ডিত থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু তাঁর মন্তব্যে ইতিমধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের আবেগকে আহত করে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরির দায় তসলিমার। তসলিমার কাজে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অবশ্যই খুশি হয়েছে। তসলিমা বুঝে বা না বুঝে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় মৌলবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন।

টু-ইন-ওয়ান

তসলিমাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 'টু-ইন-ওয়ান' বা 'একের মধ্যে দুই' হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাঁকে দিয়ে একদিকে এই উপমহাদেশে যেমন ধর্মের রাজনীতি করেছে। আর একদিকে ভোগবাদের চূড়ান্ত রূপ যৌনতার বিপণন সাজিয়েছে। 'আমার মেয়েবেলা' থেকে 'উতল হাওয়া' বিকোচ্ছেও ভাল। বাক্ স্বাধীনতার মুখোশের আড়ালে অশালীন, নোংরা শব্দবিন্যাস ও পর্ণ রচনা করেছেন তসলিমা। তিনি নিজের বহুগামীতা ও মা-বাবার যথেচ্ছ যৌনাচারের কাহিনী টেনে এনে যেভাবে তাঁদের জনসমক্ষে উলঙ্গ করেছেন, তা অকল্পনীয়, ক্ষমার অযোগ্য।

টু-ইন-ওয়ান তসলিমাকে ব্যবহার করে বিশ্বায়নের বাজারে ধর্ম ও যৌনতা বিক্রির বাজার খুলে বসেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই বাজার বন্ধ করতে পারি আমরা, ক্রেতারা। আমরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই—তসলিমার বই কিনব না, পড়ব না, উপহার দেবো না, তসলিমাকে উপেক্ষা করব—তবে কি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পারবে তসলিমাকে পণ্য করতে? না। পারবে না।

সমাজসংস্কারক : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

চৈতালী

অবিভক্ত বাংলার রঙপুর জেলার পায়রাবন্দে ১৮৮০ সালে এক জমিদার পরিবারে জন্মেছিলেন রোকেয়া খাতুন। ডাক নাম ছিল 'রকু'। তাঁর পিতা জহিরউদ্দিন আবু আলি হায়দর সাবের ছিলেন রক্ষণশীল মানুষ। তাঁর পরিবারের মেয়েদের কঠোর পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হত। পরিবারের শিশুকন্যাদেরকেও বাড়িতে কেউ অতিথি, পুরুষ বা মহিলা হোক, এলে ছুটে পালিয়ে লুকিয়ে পড়তে হত বাড়িরই কোনও গোপন জায়গায়। কোরান ছাড়া অন্য কোনও বই মেয়েদের পড়তে দেওয়া হত না। রোকেয়ার বড়ভাই ইব্রাহিম সাবের তাঁর মধ্যে পড়ার আগ্রহ লক্ষ করে পিতার অগোচরে ছোটবোনকে প্রাথমিক ইংরেজি পড়াতে শুরু করেন। পরিবারের আর সকলে ঘুমোতে গেলে মধ্যরাতের নিভৃতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বড় ভাই রোকেয়াকে পড়াতেন। তাঁর বড়বোন করিমুন্নেসা এত প্রতিভাময়ী ছিলেন যে তিনি নিজেই বাংলা লিখতে ও পড়তে শেখেন। তিনিই রোকেয়াকে বাংলা শিখতে সাহায্য করেন। অভিজাত রক্ষণশীল সেই মুসলমান পরিবারে বাংলা শেখার প্রথা ছিল না—কারোরই জন্য।

১৮৯৬ সালে ষোলো বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হল উদারহৃদয়, ইউরোপে উচ্চশিক্ষিত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বিপত্নীক, প্রৌঢ় অবাঙালী, ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। বাড়িতেই জ্ঞানচর্চার এক অকল্পনীয় সুযোগের সিংহদুয়ার খুলে গেল। গড়ে নিতে হবে নিজেকে। আনন্দে উদ্বেল হল পর্দায় অবরুদ্ধ মন। কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে থাকলেন। এরপর দুই কন্যা-সন্তানের জন্ম হল। কিন্তু মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাদের দু'জনকেই। বিয়ের তেরো বছরের মধ্যে রোকেয়ার ২৯ বছর বয়সেই ঘটল স্বামীর মৃত্যু। এই তীব্র আঘাত বুকে নিয়েই জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য স্থির করে ফেললেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বহুযুগ ধরে গেড়ে বসে থাকা রক্ষণশীল সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হানতে হবে। ধর্মের নামে ধ্বজাধারী স্বার্থান্বেষীরা নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছে। এ ধর্মশাস্ত্র পুরুষের রচনা। 'নারী কেন বলতে পারবে না, আমি গোলাম নই।' নারীর শিক্ষা, এমনকি উচ্চশিক্ষারও প্রয়োজন। "সুযোগ্য বিদূষী ভগ্নীরাই দাসত্বের সুকঠিন দুর্গকে ভূমিসাৎ করে দেবে।"

হ্যাঁ—একথা ঠিক, পদে পদে আসবে বাধা, কটূক্তি, নির্লজ্জ হিংস্রতা। কিন্তু তাকে পরাস্ত করতে হবে অমায়িক যুক্তি, অসীম ধৈর্য আর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে। এমন তেজ, বলিষ্ঠতা, উন্নত চিন্তা কেবল মুসলমান সমাজে কেন, হিন্দু নারী সমাজেও সেকালে ছিল বিরল।

শুরু হল মহীয়সী এই নারীর একক পথচলা। স্বপ্নকে রূপদানের অদম্য স্পৃহা। মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়—শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের মর্যাদার আসন গড়ে দিতে হবে। তবেই তারা জাগবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রোকেয়া। স্কুল খুলতে হবে। প্রথমেই চেষ্টা করলেন ভাগলপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার। স্বামী রোকেয়ার আগ্রহের কথা জেনে তাঁকে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের জন্যে দিয়ে যান দশ হাজার টাকা। তাঁর মৃত্যুর পর ভাগলপুরেই রোকেয়া চেষ্টা করেন স্কুল স্থাপনের, শুরুও করেন। কিন্তু সপত্নী কন্যা ও জামাতার বিরোধিতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। ভাগলপুরের পাট চুকিয়ে চললেন কলকাতার পথে। তালতলার ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ্ লেনে বাড়িভাড়া করে স্থাপন করলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। স্বামীর রেখে যাওয়া টাকা দিয়ে আর সংকুলান হচ্ছে না। ব্যাঙ্ক ফেল করায় স্বামীপ্রদত্ত অর্থ হারান। স্কুলের জন্য উদ্বেগে অস্থির রোকেয়া অর্থ সাহায্য চেয়ে আত্মীয়স্বজন ও ধনী মানুষদের কাছে পত্র লিখতে দ্বিধা করতেন না। বেরিয়ে পড়লেন বিবেকবান মানুষদের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায়। পর্দা প্রথার বিরোধী হলেও অভিভাবকদের কাছে আস্থা অর্জনের জন্য মনের সঙ্গে লড়াই করে পর্দা পালন করেই রাস্তায় নামলেন। মেয়েদের জন্যে শিক্ষা রোকেয়ার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। স্কুল পরিচালনা, ক্লাস নেওয়া, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করা এবং এর মাঝে কঠিন কঠোর পরিশ্রম করে ছাত্রী সংগ্রহ করা। স্বইচ্ছায় এ দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে নারী শিক্ষার প্রচার চালাতে হল। সমাজের অযৌক্তিক নিয়মকানুন, অবিচার, অত্যাচার সহ্য করে চললেন নীরবে। জানতেন একদিন এই স্কুল থেকেই বেরিয়ে আসবে পর্দা ভাঙার শক্তি। এভাবেই স্কুল হয়ে উঠল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, একমাত্র বাসস্থান। এ যে কতবড় দুঃসাধ্য সংগ্রাম, সেদিনের সংকীর্ণ সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত প্রথা ও বিধানের বাইরে এক পা ফেলার সাধ্য পুরুষদেরই যখন ছিল না, একাকিনী অসহায় এক নারীর পক্ষে কতবড় আত্মমর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হলে, কতবড় মনোবল ও দৃঢ়তা থাকলে দিনের পর দিন কুৎসা, নিন্দা, হুমকি, বিদ্রূপের সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব—তা আজ কল্পনা করাও কঠিন। কেবল শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে সমাজ পুনর্গঠন নয়, তার সঙ্গে চলল সমাজ অগ্রগতির প্রয়োজনে যুক্তিনিষ্ঠ মনন সৃষ্টির উপযোগী প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নক্সাধর্মী রচনা। রচনায় পাওয়া গেল নির্ভীক রোকেয়ার সদাকল্যাণময় প্রাণের স্পর্শ। এ রচনাগুলি মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত। নারী চরিত্রের একটি সহজ মহিমা ও শুচিতা রক্ষায় তাঁর লেখনী যেন নিজ চরিত্রের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকেই প্রস্ফুটিত করে।

শুধু মেয়েদের জন্য স্কুল করেই ক্ষান্ত হননি তিনি। ছাত্রীদের মায়েদের জন্যও গঠন করলেন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি। এখানে মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও লেখাপড়া শেখানো এবং দরিদ্র মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস চলত। অজ্ঞ মুসলমান মেয়েদের 'সমিতি' কাকে বলে বোঝানো হত বিভিন্ন উপায়ে।

পাশাপাশি মুসলিম মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজেও তিনি পথ দেখালেন, যা আজও যে কোনো সমাজ রূপকারের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। কাজ, কাজ আর কাজ। শরীর আর চলে না। মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে ভোর রাতে হঠাৎ রোকেয়ার জীবনাবসান ঘটে।

একশো বছর আগে লেখা পত্রপত্রিকা থেকে রোকেয়া হোসেনের লেখার কিছু নমুনা :—

"আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি তো এ অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না!"

(স্ত্রীজাতির অবনতি, ১৩১০)

"উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামীর' গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?" (স্ত্রীজাতির অবনতি, ১৩১০)

"নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতাদেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানসীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রানি, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক—সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোনও বালকের যে সম্বন্ধ সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল; তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে;....আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাঁদিয়া ফেলিয়া দিতে পারে—কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে নাই, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ।"

(অর্দ্ধাঙ্গী, ১৩১০)

"...এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! ...এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ইহারই উপর নির্ভর করে। অভ্যাসের কি অপার মহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী।" (স্ত্রীজাতির অবনতি, ১৩১০)

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের লিফলেট অবলম্বনে]

বাঁকুড়া যুক্তিবাদী : বেলিয়াতোড় শাখা

মার্চ ২০০৯-১১ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত বেলিয়াতোড় মেলাতে প্রমাণ সাইজের কাগজের পুতুল বানিয়ে '**জ্যোতিষ একটি অপবিজ্ঞান**'—বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। এছাড়া এই ক'দিন বেলিয়াতোড় শাখা সম্পূর্ণভাবে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের সাহায্যে নিয়োজিত ছিল। এই মেলাটিতে বহুল পরিমাণে জনগণের সমাগম হয়েছিল।

সংক্রান্তিতে চড়ক-গাজন-ঝাঁপান ও মৃতদেহ নিয়ে গেন্ডুয়া খেলা

এবার চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের মেলার সঙ্গে ঝাঁপান ও চড়কের ছবি তোলা হয় সমিতির বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে। ছবি তোলেন চাকদার মানসী, বর্ধমানে সঞ্জয় কর্মকার ও বাঁকুড়ায় বিপ্লব দাস।

চড়কের মেলার পাশাপাশি কিছু বীভৎস ও বিপজ্জনক প্রথা চলে আসছে; সেদিকে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ছবিসহ রিপোর্ট পাঠানো হয় বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, যুক্তিবাদী সংগঠন ও ওয়েবসাইটে।

মানসী ফটো তোলার সময়েই চড়কের বাঁশ ভেঙে পড়ে ও ঘুরন্ত অবস্থায় অনেক উঁচু থেকে পড়ে গুরুতর জখম হয় একজন। ঘটনাটি ঘটে চাকদার শিলিন্ডায় বালিয়া স্কুলের মাঠে।

বর্ধমানের কাছে যা হয়, তা এক কথায় বীভৎস। পারুই, কুরমুন ইত্যাদি গ্রামের গাজন সন্ন্যাসীরা কবর খুঁড়ে পচা-গলা শবদেহ ও দেহের কাটা মুন্ড নিয়ে নাচানাচি করে। শিশু, মহিলাসহ সবাই ভিড় করে দেখে। শিশুদের সামনে ওই দুর্গন্ধ মৃতদেহ (অধিকাংশ সময়ে মৃত শিশুর দেহ) ঝুলিয়ে ভয় দেখানোও হয়।

বিশ্বাস না হলে সঞ্জয়ের তোলা ফটো ও রিপোর্ট দেখুন www.thefreethinker.tk এ। এছাড়া nirmukta.com সহ পৃথিবীর একশোর বেশি ওয়েবসাইটে। এ কোন আদিম সমাজে বাস করছি আমরা? পুলিশ প্রশাসন চুপ কেন? আশাকরি সঞ্জয়দের এই আবেদনে ইতিবাচক সাড়া মিলবে।

জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে আইন আরও কড়া হল

বিপ্লব দাস

জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, ম্যাগনেটোথেরাপি, হাইড্রোথেরাপি, ফেং শুই-সহ সমস্ত রকম বাবাজী মাতাজীদের শায়েস্তা করতে আরও কড়া আইন প্রণয়নের জন্য যুক্তিবাদীরা বহুদিন ধরেই সওয়াল করে আসছে। এর সুফল এবার পাওয়া যাবে। 'দ্য ড্রাগ অ্যান্ড কস্‌মেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০' আইনটিকে গত ১৯ মার্চ আরও আঁটোসাঁটো করা হল।

জ্যোতিষ, তান্ত্রিকদের জেলে ঢোকাবার জন্য অনেক আইন রয়েছে। আমজনতা এই আইনগুলো জানলে এইসব হিজিবিজিদের বেআইনি কাজকর্ম রোখা সম্ভব হবে। আইনগুলোর সম্বন্ধে বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। ফলে জ্যোতিষী আর তান্ত্রিকদের হেঁকে ডেকে প্রতারণা চলছে। আইনগুলো জানা থাকলে একজন আম-আদমিও পারেন পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে। শাস্তির বিধান শুধু জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের মতো ঠগ জোচ্চোরদের জন্য নয়। যে সংবাদমাধ্যমে ওদের প্রচার হবে তারাও ঢুকবে জেলে। জ্যোতিষী-তান্ত্রিক-সংবাদমাধ্যমের অশুভ গাঁটছড়া ভাঙতে আপনার আমাদের শুভ ও সাহসী যৌথ প্রচেষ্টা জরুরি। তারই সঙ্গে জরুরি হল এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ভালো করে জেনে নেওয়া।

'দ্য ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০' অনুযায়ী ড্রাগস বা ওষুধের সংজ্ঞা বলতে কী বোঝায় দেখা যাক। ওই আইনে ড্রাগস বা ওষুধের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সমস্ত রকমের ওষুধ যা মানুষ যা পশুদেহের ভিতরে ও বাইরের প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং সেইসব পদার্থ যা রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, তীব্রতা হ্রাস বা প্রতিষেধক হিসেবে ব্যাধির জন্য মানুষ বা পশুর দেহে ব্যবহার করা হয় জীবাণু তাড়াবার জন্য। সেখানে বলা আছে, রোগ সারাবার জন্য যে কোনোও পদার্থ কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের ড্রাগস ল্যাবরেটরির দ্বারা পরীক্ষিত এবং নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে তৈরি করতে হবে। এর অন্যথা হলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ওষুধ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট ড্রাগস ল্যাবরেটরি অথবা রাজ্য সরকার ঘোষিত সংস্থা থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। লাইসেন্স ছাড়া অসুখ সারাবার কোনো দ্রব্য তৈরি, প্যাকেজিং, ড্রিস্ট্রিবিউশন ও বিক্রি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যে কোনো রোগ গ্যারান্টি দিয়ে সারাবার নামে যারা তাবিজ, কবচ ইত্যাদি বিক্রি করে তাদের ওইসব তাবিজ-কবচ ওষুধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। বিনা লাইসেন্সে এই জাতীয় ওষুধ বিক্রি অবশ্যই অপরাধ। আইনটি বহুদিন ধরে আছে। এর প্রয়োগে বহু প্রতারক, বুজরুকদের শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবু কেন যেন জুতসই হচ্ছিল না। যুক্তিবাদী সমিতি চাইছিল আরও কড়া আইন। ২০০৫ সালে মার্চ মাসে যুক্তিবাদী সমিতির করা অভিযোগের ভিত্তিতে জ্যোতিষী সত্যানন্দের গ্রেফতারের সময় থেকেই সমিতির উদ্যোগে বহু বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞরা এই আইনটিকে আরও জোরদার করার রূপরেখা তৈরিতে সচেষ্ট হন। তৎকালীন আইনমন্ত্রী নিশীথরঞ্জন অধিকারী, মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী গোলাম রসুল ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ এবং ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রক সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এই কর্মযজ্ঞ শেষ পর্যন্ত সাফল্য পেল। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ১৯ মার্চ জি.এস.আর. ৮৮৪(ই) নোটিফিকেশনে জানাল প্রতিটি ওষুধের ওজন, আয়তন, উপাদানসমূহের পরিমাণ ওষুধের লেবেলের গায়ে না সাঁটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হবে। ওষুধ সেবনের ফলে রোগীর মৃত্যু বা আশঙ্কাজনক ক্ষতি হলে ওষুধ প্রস্তুতকারকের শাস্তি আজীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। ড্রাগ কন্ট্রোলের নির্দেশ অমান্য করে ওষুধ প্রস্তুতকারকের জরিমানাও বাড়ানো হয়েছে। বাজেয়াপ্ত ওষুধের মোট মূল্যের তিনগুণ অথবা দশ লক্ষ টাকার মধ্যে যেটি বেশি তা জরিমানা রূপে আদায় করা হবে। ড্রাগ সেবনে ক্ষতিগ্রস্ত রোগীর ক্ষতি পূরণের কথাও বলা আছে। আর এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ওষুধ প্রস্তুতকারকের জরিমানার টাকা থেকে।

আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গবাসী হন, এবং কোনো তান্ত্রিক বা জ্যোতিষী যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আপনার কাছে কোনো তাবিচ, কবচ, মাদুলি বা ওই ধরনের কিছু বিক্রি করে তবে আপনি আপনার অভিযোগ দায়ের করবেন এই ঠিকানায়—ডিরেক্টরেট অফ ড্রাগস কন্ট্রোল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। অভিযোগ দায়ের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে তান্ত্রিক-জ্যোতিষীর রোগ সারাবার কোনো বিজ্ঞাপন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত থাকলে তার জেরক্স কপি অভিযোগপত্রের সাথে যুক্ত করে দেবেন। মূল পত্রিকা যত্ন করে রেখে দেবেন। মামলা চলাকালীন কাজে লাগবে। আপনার অভিযোগ পাওয়ার পর ড্রাগস কন্ট্রোল থেকে অভিযুক্তের কাছে জানতে চাইবে এই ধরনের তাবিজ কবচ (যা আইনের সংজ্ঞায় ওষুধ বা ড্রাগ) তৈরির বৈধ লাইসেন্স তার কাছে আছে কিনা। ড্রাগস কন্ট্রোলের দেওয়া লাইসেন্স ছাড়া ওষুধ বানানো বা বিক্রির জন্য ওই জ্যোতিষী-তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করবে ড্রাগস কন্ট্রোল। মামলাটি হবে অভিযুক্ত তান্ত্রিক-জ্যোতিষী বনাম সরকার। আপনাকে বড়জোর সাক্ষী দেওয়া ছাড়া কিচ্ছুটি করতে হবে না।

একটা বিষয় নিয়ে একটা গোটা বই—গ্লোবাল ওয়ার্মিং

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বিপ্লব দাস। দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩। ৮০ টাকা।

বাংলায় এমন বই নেই। জোর দিয়েই কথাটা বলছি। বইটার নাম 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'। বঙ্গানুবাদে বিশ্ব উষ্ণায়ন নয়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং শব্দটা অনেক ইংরেজি শব্দের মতোই বাংলা ভাষা ভাণ্ডারে ঠাঁই পেতে চলেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন কথাটা ততটা প্রচলিত হয়নি। লেখক বিপ্লব দাস বইটার নাম 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'ই রেখেছেন।

বিজ্ঞান মানে যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটারি জটিল অঙ্ক নয়। বিজ্ঞান হল প্রকৃতির নিয়মগুলিকে বোঝার চেষ্টা করা এবং ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কার্যকারণ খোঁজার চেষ্টা করা। যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা। রোজ কত কী যে ঘটে যাহা তাহা, কিন্তু এইসব যাহা তাহার মধ্যেই রয়েছে কার্যকারণ সম্পর্ক। এবং ওই সব সম্পর্কগুলি সমাজ নিরপেক্ষ নয়। প্রতিটি অ্যাকশনের রি-এ্যাকশন আছে এবং রি-এক্যশনেরও রি-অ্যাকশন আছে। এই অ্যাকশন-রি-অ্যাকশনের প্রভাব মানুষের জীবনযাপনে পড়ে। মানব সভ্যতা নদীর মতই আঁকাবাকা পথে এগোয়। এরই মধ্যে রয়েছে গ্রহণ বর্জন। বেশ কিছু ঘটনার প্রভাবে মানুষের সামাজিক সম্মতি থাকে, এ মানুষের অসম্মতিও থাকে। যেহেতু আমাদের পৃথিবীর মনুষ্য সমাজ শ্রেণী বিভক্ত, তাই কোনও কোনও অ্যাকশনে একটি শ্রেণী সম্মত থাকলেও অন্য শ্রেণী সম্মত থাকে না। শক্তিশালী শ্রেণি তাদের কার্যকারণ দুর্বল শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেয়। এই ঘটনা চলছে।

শিল্প বিপ্লবের পর মানুষের জীবন যাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। পৃথিবীর সম্পদ আহরণ করে মানুষ চেষ্টা করেছে। দেখা গেল কিছু মানুষের জীবনে বৈভব এসেছে ঠিকই, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ বৈভবের নামে ভোগ করছে সুখ ও স্বস্তি হীনতা। এবং যারা বৈভবকে ভোগ করতে চেয়েছিল তাদের জীবনেও অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মতো ধেয়ে এসেছে সংকট।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং এরকমই একটা সংকট, যা মনুষ্য সৃষ্টি। মানুষের লোভ ও লালসার ফল—যা পশুপাখি বৃক্ষলতা সমেত গোটা মানবজাতির অস্থি বিপন্ন করে তুলেছে। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমেত সহজ বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন লেখক।

আমাদের এই পৃথিবীতে বারবার সংকট এসেছে। আগ্নেয়গিরির আগুন, উল্কাপাত, দাবানল, হিমপ্রবাহ, আরও কত কী। কিন্তু তা সবই প্রাকৃতিক। গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রাকৃতিক নয়, তৈরী করা।

বিপ্লব দেখিয়েছেন—আজ থেকে ৪২৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল ৩৭° সেন্টিগ্রেড। কমতে কমতে আজ ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৮৬০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজার বছরে ০.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ১৯২১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত প্রতি হাজারে বছরে ০.৪ ডিগ্রি আর ১৯৪৬ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত হাজার বছরে ০.৪৫ ডিগ্রি হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১০০ বছরে গড় তাপমাত্রা ০.৭৫ ডিগ্রি বাড়িয়ে ফেলেছি। এটা অনেকটাই।

বিপ্লব পৃথিবীর আদিকালের কথা বলেছেন, উষ্ণ যুগ এবং হিম যুগের কথা বলতে গিয়ে পৃথিবীর জিওলজিক্যাল ক্রমবিবর্তনের কথা বলেছেন, বায়ুমণ্ডলের কথাও বলেছেন। বায়ুমণ্ডল বুঝতে না পারলে আমরা গ্রীণ হাউস এবং ওজন স্তর ভাল করে বুঝতে পারব না। গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলি, যা আমাদের বায়ুমণ্ডলে চাদরের মত থাকে, পৃথিবীর তাপকে মহাশূন্যে বিকিরণ হতে বাধা দেয়, সেই সব গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলির উৎপত্তির কথা বলেছেন। দেখেছেন পৃথিবীর মস্তান দেশগুলিই সবচেয়ে বেশি গ্রীণহাউস গ্যাস পরিবেশে ছড়ায় এবং ওরাই পরিবেশ নিয়ে বেশি খবরদারি করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অসহায়তার ছবি ফুটে আসে। যে ক্লোরো ক্লোরো কার্বন ওজন স্তরে ফুটো করে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে পৃথিবীতে আসার দরজা খুলে দিচ্ছে সেই গ্যাসের উৎপত্তি এবং কেন ওজনস্তরে ফুটো করে বিঘ্ন ঘটায় সেই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে মাখামাখি করে যে সমাজতত্ত্ব সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে কী কী হতে পারে তা বলেই শেষ করেন নি। আমরা কী কী করতে পারি সেটাই বলেছেন বেশি করে।

সবচেয়ে ভাল লেগেছে বিপ্লব কোনও পার্টি লাইন মেনে এসব বলেননি। পরমানুবিক বিদ্যুৎ সম্পর্কে তার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের খুব ভালো লেগেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ সম্পর্কে একটা ছ্যুৎমার্গ আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশে ধরেছি। বিপ্লব বলেছেন পারমাণবিক শক্তিকে অচ্ছুত করে রাখলে আমাদের ভাল হবে না। সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতেই হবে। আমরা ভূ-তাপীয় শক্তি এবং সমুদ্র তরল শক্তির কথা আদৌ ভাবিনি। কিন্তু এর সম্ভাবনা আছে। তাপবিদ্যুতের প্ল্যান্ট গুলিই বেশি দূষণ ঘটায়। ফলে অন্যশক্তির সন্ধান। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের জীবন ধারার পরিবর্তন ঘটানো। আরও সাধাসিধে। উন্নয়ণের ভাবনাটা অন্যরকম করে ভাবতে হবে আমাদের। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহনশীল উন্নয়ন গতে শুধু

ধনী নয়—গরীবরাও উন্নয়নের ফল পেতে পারেন।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে যে বিশ্বরাজনীতির খেলা—এদিকটাও এড়িয়ে যাননি বিপ্লব। একটি আমাদের অধ্যায় রয়েছে। এবং শেষ অধ্যায়টির শিরোনাম—আমি আপনি কী করতে পারি। খুব সহজ ভাষায় দরকারি কথা বলেছেন বিপ্লব।

সব কিছু মিলিয়ে এটা একটা দরকারি বই। এরকম একটা বইয়ের প্রয়োজন ছিল। বিপ্লব পেশায় ইঞ্জিনীয়ার তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি ওর ভালভাবেই জানার কথা। কিন্তু বইটার প্রতি ছত্রে ছত্রে মিশে আছে আন্তরিকতা। পৃথিবীটাকে ভালোবাসেন লেখক। বইটা ভালো করে পড়লে ভালোবাসার সংক্রমণ ঘটবে।

বেআইনিভাবে 'গেরিলাযুদ্ধের A to Z' এবং 'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস' বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

বাঁকুড়ার সিমলাপালে একটি স্থানীয় বাজারের দোকান থেকে জোর করে পুলিশ দুটি বই তুলে নিল। বই দুটির নাম "প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং..." ও "গেরিলাযুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি"।

জোর করে বই দুটি বাজেয়াপ্ত করে ও স্থানীয় দোকানের মালিক তুষারকে হেনস্থা করে পুলিশ নিজেই প্রমাণ করল বই দুটির প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা।

বই দুটি নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়নি। যে কোনও দোকানে, মেলায় বা গ্রন্থাগারে রাখার অধিকার সকলেরই আছে।

এই ধরনের জুলুমবাজীর মোকাবিলা করুন সাহসের সঙ্গে। আইনের সাহায্য নিন। বেআইনি কাজ না করলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা পাশে আছি।

পারিবারিক পরামর্শ-দান কেন্দ্র

(কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ অনুমোদিত)

যে কোনও পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন। দক্ষ আইনজীবী শ্রী শিবশংকর চক্রবর্তী ও অভিজ্ঞ কাউন্সেলররা কাউন্সিলিং করে থাকেন।

সময় : সোম, বুধ, শুক্রবার ১১টা-৪টা, ফোন : ২৪৫৪-৩৮২৮

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

দক্ষিণ কলকাতা শাখা, ১১, পালিত স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৯

গেরিলা যোদ্ধাদের গাইড বুক ইতিহাসে ঢুকে পড়ল

নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত

গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি। প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩। ১৬০ টাকা।

'অলৌকিক নয়, লৌকিক' প্রথম খণ্ড থেকে জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক' দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা লেখক প্রবীর ঘোষকে দেখেছি সমাজ কাঠামোর গলি থেকে রাজপথে সাবলীল বিচরণ করতে। কুসংস্কার ধর্মীয় উন্মাদনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার প্রতিটি বই-এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি সোচ্চার। দুনিয়া কাঁপানো ফিলিপিনের ফেইথ হিলার থেকে রামদেব, রামমন্দির থেকে লোকনাথবাবার কচুয়াধাম, কোনো না কোনো বইতে প্রসঙ্গক্রমে হাজির। বহু বেস্ট সেলার বই-এর এই লেখক, যাকে নির্দ্বিধায় সত্তর দশকের পরবর্তী জমানার শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী রূপে মেনে নিয়েছে। বুদ্ধিজীবী থেকে উইকিপিডিয়া। তাঁর কলমে 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি'—বেরোলো পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজ্য রাজনীতির এক বিশেষ সংকটময় মুহূর্তে। প্রবীর ঘোষ দু'বছর আগে লিখেছিলেন 'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...'। তথ্য-যুক্তি-বিশ্লেষণে সন্ত্রাসের যাবতীয় ধ্যান- ধারণাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে তুলে ধরেছিলেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়াবহ রূপটি। তেমনি বর্তমান বইতে গেরিলা যুদ্ধকে নিয়ে রীতিমতো কাটাছেঁড়া হয়েছে। গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আছে 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z'। এই পর্বের লেখক প্রবীর ঘোষ। প্রায় তিনশো পাতার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে প্রথম প্রবন্ধ 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z'। বিশ্বজুড়ে আমেরিকার দাদাগিরি কতটা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে বোঝাতে লেখক গোটা চল্লিশেক তথ্য পেশ করেছেন কবে কখন কোন দেশে আমেরিকা সন্ত্রাস চালিয়েছে কতটা নির্মমভাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সময়কালে নিকারাগুয়া, হাইতি, দিয়ে সন্ত্রাসের শুরু। পরবর্তী সময়ে কোরিয়া, আলবেনিয়া, ইরান, গুয়াতেমালা। ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, কিউবা—বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অনবরত সন্ত্রাস চালিয়েছে দুনিয়াদারির আনন্দে মেতে থাকা আমেরিকা নামক দেশটি। মার্কিন সেনার বিরুদ্ধে লড়তে থাকা

দেশগুলির লড়াই 'গেরিলা যুদ্ধ' বলব, নাকি নিছকই পাল্টা সন্ত্রাস? হাজার তথ্য প্রমাণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বইতে।

গেরিলা যুদ্ধের নবতম সংযোজন হল ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ এ মুম্বই হামলা। মুম্বই হামলার পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিচার করে লেখক একে ৯/১১ এর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের চেয়েও এগিয়ে রেখেছেন। গেরিলা যুদ্ধের আধুনিকতম পদ্ধতির প্রসঙ্গে এসেছে দন্ডকারণ্য, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ডে সংগ্রামরত মাওবাদীদের সাম্য প্রতিষ্ঠার লড়াই।

পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের গেরিলা যোদ্ধারা হয়তো কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের থেকেই অনুপ্রাণিত হতে পারেন; কেননা এরা দীর্ঘ দশ বছর গেরিলা যুদ্ধের পর সেখানের রাজতন্ত্র হঠিয়ে গণতন্ত্র আনতে সক্ষম হয়েছে। কোথায় গেরিলা যুদ্ধ সম্ভব কোথায় নয়, গেরিলা যোদ্ধা নির্বাচন পদ্ধতি, যোদ্ধাদের আবশ্যিক গুণ ও কর্তব্য, রাষ্ট্র-প্রশাসন-গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবী-আম-আদমি সম্বন্ধে গেরিলাদের ধারণা এবং মনোভাব কী হওয়া উচিত তার পূঙ্খাণুপুঙ্খ এবং বিস্তারিত বিবরণ পেতে বইটি যথেষ্ট সহায়ক। তবে 'গেরিলা যুদ্ধ' প্রবন্ধটিতে অনুচ্ছেদ বিভক্ত করণ, টাইটেল এবং সাবটাইটেলের হরফ বিন্যাসের কোথাও কোথাও ঘাটতি থাকায় মনসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে।

গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া প্রবীর ঘোষের আরও এগারোটি প্রবন্ধ রয়েছে এই বইতে। তার মধ্যে কয়েকটি 'যুক্তিবাদী' পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত হলেও এখানে সেগুলির উপস্থিতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে 'তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন', 'গোর্খাল্যান্ড', 'সংযম স্বাগত: তসলিমা'—পাঠকের দীর্ঘদিনের ধ্যানধারণাকে এক লহমায় পাল্টে দিতে সক্ষম। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে লেখকের মনে হয়েছে, একটি এই পাতা ঝরা মরসুমে একবৈশাখী হাওয়া আসছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে। পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতার বিরুদ্ধে একচেটিয়া পার্টি রাজের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের একক কিম্বা দলগত বিক্ষোভ পর্যালোচনা করে তিনি লিখেছেন তার শেষ প্রবন্ধটি 'অব্যাহত ডিসকোর্স-এর জয়যাত্রা'—যা ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলে পরিণত হবে ভবিষ্যতে।

বইটি দুটি পর্বে বিভক্ত। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে 'আজাদি'। সুমিত্রা পদ্মনাভনের যুগোপযোগী প্রবন্ধ সংকলন।

সুমিত্রা পদ্মনাভনকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চিনি হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ সম্পাদক রূপে। তিনি 'যুক্তিবাদী' ম্যাগাজিন এবং 'The free thinker' ওয়েবসাইট ম্যাগাজিন-এর (www.thefreethinker.tk) সম্পাদকও বটে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখাগুলিতে আমরা লক্ষ

করেছি জ্ঞান, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত এবং সংবেদনশীলতার এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য। কিছু সামাজিক সমস্যা যেগুলি বর্তমান সময়টিকে প্রচণ্ড নাড়া দেয় অথচ আমরা আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে দিশেহারা সেখানেই বারে বারে সঠিক দিশার সন্ধান দিয়ে গেছেন সুমিত্রা।

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৮, দীর্ঘ এগারো বছরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কুড়িটি বেছে নেওয়া হয়েছে এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্ব 'আজাদি'র জন্য। প্রতিটি প্রবন্ধই অত্যন্ত সুপাঠ্য এবং প্রাসঙ্গিক। 'শিবরাত্রি ও নারীদিবস', 'মহাপুরুষদের মূল্যায়ণ', 'মানুষের ধর্ম মানবতা' এসব প্রবন্ধে যেমন চিরাচরিত এবং বহু আলোচিত সমস্যাগুলির পর্যালোচনা হয়েছে তেমনই 'ইংরেজি না বাংলা'? 'নার্কোটেস্ট', 'স্বেচ্ছামৃত্যু'-তে এমন সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত আর কোনোও প্রাবন্ধিকের কলমে ফুটে ওঠেনি। পাঠকেরা নিত্যকার জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় টিপস পেতে পারেন 'নারীমুক্তি যুক্তি দিয়ে', 'মেয়েদের জন্য দশটি সাজেশন' কিম্বা 'সন্তানকে সামলে রাখুন' ইত্যাদি প্রবন্ধে। মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার এই লেখিকা মণিপুরের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে, রিজওয়ানুর হত্যা, নন্দীগ্রামে সি পি এমের সন্ত্রাসে-র বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরব হয়েছেন আমরা দেখেছি। তাই তার রাজনৈতিক মতাদর্শের ছোঁয়া লেগেছে সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান নিরূপণে। 'মণিপুরে এখন', 'ছত্তিশগড়' এবং 'আজাদি' এই তিনটি প্রবন্ধে তিনি একদিকে যেমন দেখিয়েছেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কবলে মানবাধিকার অন্য দিকে তুলে ধরেছেন ছত্তিশগড় ও কাশ্মীরের সংগ্রামীদের ইতিবাচক দিকগুলি।

সুমন রায় এবং সুমিত্রার প্রচ্ছদ পরিকল্পনা অসাধারণ। হরফ বিন্যাস, বাঁধাই প্রতিটিই স্বনামধন্য প্রকাশকের যথাযোগ্য দায়িত্ব পালনের ইঙ্গিত দেয়। শুধুমাত্র প্রুফরিডিং-এ আরও একটু মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন ছিল। সামান্য দু-একটি ত্রুটি ছাড়া এককথায় বইটি ইতিহাসে ঢুকে পড়ল।

'আইনের চোখে সবাই সমান'

"নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটা বাণী আছে সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না...যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।"

—'কালান্তর', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধানী মন জরুরি

"সন্ধান করে ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন তৈরি করা কম নয়।"

—'রাশিয়ার চিঠি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স ত্যা নু স ন্ধা ন

বানফোঁড় ও চড়ক : প্রতিবাদ যুক্তিবাদীদের

বিপ্লব দাস

—আপনার নাম?

—রতন মাহাতো।

ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ রতনের পেটের দু'পাশে দু'বগলের নীচে, দু'কানের নীচে... আট জায়গায় ছাতার সিকের মতো সরু সরু লোহার দন্ড ঢোকানো, চামড়া এফোঁড় ওফোঁড় করে। রতন গায়ে অষ্টাঙ্গ বান ধারণ করেছেন। শুধোলাম, এই যে এতগুলো সিক গায়ে ঢুকিয়েছেন। রক্তও তো পড়ছে দেখছি। ব্যথা লাগছে না আপনার?

—ব্যথা লাগবেক কেনে? একদম লাগছে নাই। বিকালে দেখবেন চড়ক। পিঠে কাঁটা ঢুকায়ে বনবন করে ঘুরব্যেক।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলা তার জবাবে স্তম্ভিত আমি আর কথা বাড়ালাম না। ক্যামেরা লেন্স এল সি ডিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। গোটা গায়ে অষ্টাঙ্গবাণে বৃদ্ধ বৃদ্ধাটির উদ্দাম নাচের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করার জন্য ইতিমধ্যে আরও দু'চারটি ক্যামেরা ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে ব্যস্ত। হাজার হাজার দর্শক যন্ত্রণাময় দৃশ্য দেখতে হামলে পড়েছে।

গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম আকর্ষণ চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক মেলা। আর আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সংস্কৃতির মিলনস্থল বাঁকুড়া জেলার চড়ক মেলাগুলি স্বভাবতই জেলার ভৌগোলিক এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ধারা বজায় রাখে। প্রাচীন লোক দেবতা কালামদন, বাঘুৎ, ঝাঁপুড়্যা, কঁকাঠাকুর, ঘোড়াপাহাড়ী, মুড়াভাঙ্গা, দুলালী, বনপাহাড়ী, বলদ্যাবুড়ি, খুদ্যানাড়া, বাঁদাড়া, ছড়ি দাও, আমতুল্যা, তেঁতুলমিলা, খয়রাবুড়ি, ঝগড়াই, সাধনবোঙ্গা, বুড়াবুড়ি-র পাশাপাশি শিব-মনসা, চন্ডী-র পুজো হয় বিভিন্ন মেলায়। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি পুজো পান শিব। জেলায় সাতশোর ওপর শিবের থান রয়েছে। শিবের থানকে কেন্দ্র করে বহু জায়গাতেই চৈত্র সংক্রান্তির গাঁজন মেলা হয়ে থাকে। তবে বানফোঁড়া বা চড়কের মতো অমানবিক এবং নিষ্ঠুর প্রথাটি সব মেলায় নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রেই এটি হয়। সংখ্যায় এবং ভয়ঙ্করতায় সবচেয়ে বেশি বানফোঁড় হয় পাঁচালের রত্নেশ্বর মুনির মেলায়।

বাঁকুড়া শহর থেকে বর্ধমান রোড ধরে পঁচিশ কিলোমিটারের মাথায় ছান্দার। এখানেই রাজ্য সড়ক ছেড়ে গ্রামীণ সড়ক ধরে শাল, পলাশের ঘন জঙ্গলের মাঝ

দিয়ে দশ কিলোমিটার গেলে জঙ্গলে ঘেরা গঞ্জ পাঁচাল। এখানে বেশ কয়েকটি বর্ধিষ্ণু এবং শিক্ষিত পরিবারের বাস থাকলেও আশেপাশে সমস্ত গ্রামগুলিই আদিবাসী প্রধান, শিক্ষা বঞ্চিত এবং তারা জঙ্গল থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে।

চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচ দিন ধরে পাঁচালের রত্নেশ্বরের থানে চলে গাজন উৎসব। এক্তেশ্বর, ষাঁড়েশ্বর, সিদ্ধেশ্বরের মতো রত্নেশ্বরও শিবের আরেক নাম। গাজনের দিন সারারাত ধরে চলে বানফোঁড়। গত সাতদিন ধরে নানা উপাচার সেরে ভক্তরা সেদিন নিকটবর্তী পরশ পুকুরে স্নান করে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধাতব সিক ঢোকান। বীভৎস লাগে যখন দেখি তর্জনীর আঙুলের ন্যায় মোটা কোনো লোহার রডকে জিভে ফোঁড়া হচ্ছে। সেই বড় লম্বায় একহাত হতে পারে আবার দশ হাত হতে পারে। লম্বায় বেশি হয়ে গেলে ভক্তের দু'দিকে দু'জন থাকে হাত দিয়ে ধরে রাখার জন্য। আর রয়েছে শরীরের আটটি অঙ্গে ফোঁড়া অষ্টাঙ্গবাণের ভক্ত। ধর্মীয় উন্মাদনায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ভক্তরা বান ফোঁড় অবস্থাতেই সারা রাত ধরে ঢাকের তালে তালে নাচানাচি করতে থাকে। অজস্র দর্শক দাঁড়িয়ে থাকে পরশ পুকুর থেকে শিবের 'মাড়' অবধি রাস্তার দু'পাশে। আশেপাশের কয়েকশো গ্রামের বাসিন্দারা সে রাতে ঘুমোন না। সবাই হাজির পাঁচালের বাণফোঁড় অনুষ্ঠানে। ভোর হতে না হতেই একজন একজন করে ভক্তরা শিবের মাড়ে গিয়ে শরীর থেকে বাণ মুক্ত করেন। 'ধামাত কন্যা' নামের প্রধান পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য পুরোহিতরা বাণ খোলায় সাহায্য করে এবং এর বিনিময়ে ভক্তের কাছে প্রণামী পায়। ভোর থেকে শুরু হলেও প্রায় তিন চারশো বাণ মুক্ত করতে বেলা গড়িয়ে যায়। বিকেলে শুরু হয় চড়ক। একটি ফাঁকা মাঠে ফুট তিরিশেক উঁচু একটি কাঠের স্তম্ভ। ওপরে বলবিয়ারিং এর মাধ্যমে একটি বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে লাগানো আছে। ভক্তদের মধ্যে কারোর পিঠে দুটো করে কাঁটা ফুটিয়ে দড়ির মাধ্যমে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ওই বাঁশের এক মাথায়। অন্য মাথা দড়ির সাহায্যে ঘোরাতে থাকে কয়েকজন। পিঠে ইয়া মোটা কাঁটাগুলি ফোটানোর দৃশ্য কি নিষ্ঠুর না দেখলে কল্পনা করা যায় না। চড়কে ঝুলতে ঝুলতে বাঁই বাঁই করে পাক খেতে থাকা ভক্তটিকে দেখলে কে বলবে ওর পিঠে প্রোথিত দুটি কাঁটা, যেখানে অবিরত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

আমাদের সমিতির সদস্যরা বহু অলৌকিক নয় লৌকিক অনুষ্ঠানে বানফোঁড় করে দেখান। নবদ্বীপ শাখার ডা: গৌর মিত্র বামফোড়ায় একদম এক্সপার্ট। তার মুখেই শুনেছি বানফোঁড়ের আগের দশ-বারো দিন ভক্তরা একাহারী থাকায় তাদের চামড়ার নীচের পাতলা লিপিডের স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যার ফলে বাণ ফোঁটালে ব্যথা লাগে কম। এছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থানে অভিজ্ঞ হাতের দ্বারা বাণ ফোঁটালে ব্যথা লাগার সম্ভাবনা কমে যায়। তবু আমরা একে নিষ্ঠুর প্রথা বলব। শরীরকে কষ্ট দিয়ে এরকম ভাবে... না না মানা যায় না।

দু-চারজনের পিঠে দেখলাম অজস্র কাঁটা ফোটার দাগ। অর্থাৎ তারা বছরের পর বছর চড়কে অংশগ্রহণ করে। কিসের আশায়? একদিনের ঈশ্বর সান্নিধ্য নাকি গাজন কমিটি থেকে নগদ অর্থমূল্য? এরকম ভাবনা শুধু আমার মনে আসেনি। দু-তিন বছর আগে এসেছিল গ্রামেরই অধিবাসী শুভাশিস বাবুর মনেও।

পুরো নাম শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র। পাঁচাল গ্রামে বেড়ে ওঠা এই ভদ্রলোক কোলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। পরে ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগদান। মেজর অবধি হয়ে ছিলেন। ছোট থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক ছিল। চাকুরীরত অবস্থায় চারাগাছটি মহীরূহে পরিণত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা-লেখালেখির ফাঁকে শুরু করেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে মহাবিশ্বের রহস্য বোঝানোর কাজ। মোটরবাইক আর চারফুট লম্বা দূরবিন এই ছিল তার বহুদিনের সঙ্গী। অবশেষে চাকরী ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে গ্রামে ফিরে আসা। ইতিমধ্যে উনি দুটি কাজ করেছেন। 'বিজ্ঞান ও সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলে ফেলেছেন নিজেদের গ্রাম আর প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান নামের একটি জনপ্রিয় বই লিখে ফেলেছেন। বিজ্ঞান ও সমাজের দায়িত্ব শুভাশিসের দাদা স্নেহাশিস এবং আরও কয়েকজনের ওপর। তারা নিয়মিত পত্রপত্রিকা বের করেন এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে অজ্ঞানতা কুসংস্কার-অশিক্ষার বিরুদ্ধে মানুষকে বোঝাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। গোল বাধল গত কয়েক বছরে। রেশন ডিলারের দুর্নীতি, পঞ্চায়েতের তছরূপ, স্থানীয় সিপিএম ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করায় 'বিজ্ঞান ও সমাজ' পার্টি-প্রশাসন-পুলিশের কাছে চক্ষুশূল হয়ে পড়ে। গত পঞ্চায়েত ভোটে দীর্ঘদিনের আধিপত্য ধাক্কা খায়। পার্টির ধারণা হয় 'বিজ্ঞান ও সমাজে'-র আন্দোলনের ফলেই তাদের এই অবস্থা। সেই সময়েই বানফোঁড়ের মতো একটি সর্বজনগ্রাহ্য এবং সংবেদনশীল বিষয়ের প্রতিবাদ করায় শুভাশিসবাবুরা সরাসরি আক্রমণের শিকার হন। বলা বাহুল্য গাজন কমিটির কর্তাব্যক্তিরা প্রায় সবাই সিপিএম সমর্থক। গাজন কমিটির সেক্রেটারি আবার পার্টির লোকাল কমিটির সেক্রেটারিও। পেশায় শিক্ষক অথচ কুসংস্কারকে আঁকড়ে থাকা এই সেক্রেটারির অঙ্গুলীহেলনে শুভাশিসবাবুর পরিবার এবং শুভাকাঙ্খীরা ধীরে ধীরে অন্যান্য গ্রামবাসীর কাছে শত্রু সমান হয়ে পড়ে। এরকম একাকী এবং অসম লড়াইয়ে নেমে এবছরও 'বিজ্ঞান ও সমাজ' বানফোঁড়ের মতো নিষ্ঠুর এবং অমানবিক প্রথাকে গাজন থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে সোচ্চার হন। জনমত সংগ্রহে নামেন। আমার পাঁচাল যাত্রা ওদের উৎসাহ দানের জন্যই। তাঁদের এই চেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

বইমেলায় বিস্ফোরণ :

গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি

প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা

গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে মাও থেকে চে প্রমুখ অনেকেই বই লিখেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেক তত্ত্বই আজ আর ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। গেরিলা যুদ্ধের আধুনিকতম প্রয়োগ দেখা গেছে নেপালে, শ্রীলঙ্কায় ও ভারতের কিছু অঞ্চলে। কী সেই যুদ্ধের প্রয়োগ কৌশল? আধুনিকতম সমস্ত রকমের প্রয়োগ কৌশল নিয়ে এই গ্রন্থ। আছে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

'আজাদি'-তে আছে ২০টি ফিচার। মননশীল, বিশ্লেষণধর্মী এই ফিচারে আছে নার্কো টেস্ট, স্বেচ্ছামৃত্যু, নারী স্বাধীনতা, মেয়েদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার রেসিপি থেকে মণিপুর, কাশ্মীর ও ছত্তিশগড়ে বীভৎস মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিত্যকার ঘটনা। দুই মলাট বন্দি বই দু'টিতে পাবেন উত্তরণের দিশা।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ

প্রবীর ঘোষ-এর

মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা ১০০

মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের ডিকশনারী। সত্যিই কি তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী? নাকি কৌশলে বোকা বানাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে? আমাদের পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান? রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...১২৫

'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস'-এ এনেছেন 'সন্ত্রাস'-এর নানা সংজ্ঞা। কী বলছে উইকিপিডিয়া, রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ? 'নেপাল' প্রবন্ধে এসেছে মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, তাদের গেরিলাযুদ্ধের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি। বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের নানা জ্বলন্ত সমস্যা।

প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

"অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে, অলীক বিশ্বাসের নামে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সে একা একটি সৈন্যদল।...এই কাজে প্রবীরের প্রাথমিক প্রেরণা এবং মূল্যবান নেতৃত্ব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

— ড. পবিত্র সরকার।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

(১ম) ১৬০ (২য়) ১২৫ (৩য়) ২০০ (৪র্থ) ১২৫ (৫ম) ১০০

মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন১২৫

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920
Fax : 2219-2041 e-mail : deyspublishing@hotmail.com

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫
● e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com ●
website : www.prabirghosh.tk, www.thefreethinker.tk,
www.juktibadi.tk
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত

আমরা

যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

রবীন্দ্র সংখ্যা | মে ২০০৯ | দাম : ১৫ টাকা

নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ
কবিতাগুচ্ছ
সমস্যা : আত্মহত্যা
হিজড়েদের তোলাবাজি বে-আইনি
তসলিমা প্রসঙ্গে
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
জ্যোতিষী তান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে আইন